দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৬ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা।। ১ জানুয়ারি, ২০২৪।। ১৫ পৌষ, ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৬ বর্ষ ১৫ সংখ্যা, ১৫ পৌষ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

১ জানুয়ারি - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ মোছাবে তৃণমূল শাসিত এই রাজ্যের কদর্য মুখ— 'রেখেছ তৃণমূল করে মানুষ করনি'
◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

শীতের সার্কাস মা-মাটি-অমানুষ ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

একাধিক মুখ থাকতেও প্রকট সিদ্ধান্তহীনতা
◻ আসিম আলি ◻ ৮

কলকাতায় চূড়ান্ত সফল হিন্দু পুনরুত্থানের অনুষ্ঠান
◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

সংসদে 'হামলার' নেপথ্যে কারা? ◻ সাধন কুমার পাল ◻ ১১

ভারতীয় সংবিধানে হিন্দুস্বার্থ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে
◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ১৩

মোরদাবাদে দাঙ্গা বাধিয়েছিল মুসলিম লিগ ও কংগ্রেস
◻ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ ◻ ১৫

দীনদয়ালজীর রাষ্ট্রবাদী অর্থনীতির সফল প্রয়োগেই দেশ সমৃদ্ধ হচ্ছে ◻ ড. অনিল কুমার ঘোষ ◻ ১৭

প্রেমবিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ ◻ স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ ◻ ২৩

ভক্ত ও ভগবান : শ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যানে
◻ স্বামী আত্মবোধানন্দ ◻ ২৫

স্বামী অভেদানন্দের লেখনীতে পরমহংসদেবের কল্পতরু ও মহাপ্রয়াণের কথা ◻ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ◻ ২৯

গুরুই দেখান পথ, মেশান ঈশ্বরের সঙ্গে
◻ নন্দলাল ভট্টাচার্য ◻ ৩১

মাতৃশক্তি সারদা ◻ ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় ◻ ৩৪

ভারতে বিদেশি আক্রমণ এবং ভারতীয় যোদ্ধা
◻ অমলেশ মিশ্র ◻ ৩৫

অতিপ্রবীণরা শেয়ার বাজারের সঙ্গে নিজেদের কতটা জড়াবেন?
◻ শেখর সেনগুপ্ত ◻ ৩৭

দেশ গঠনের জন্য কিছু সংকল্প ◻ ড. রামানুজ গোস্বামী ◻ ৪৬

সনাতন ধর্ম হলো বিশ্বাস, ভক্তি ও বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ
◻ প্রদীপ মারিক ◻ ৪৭

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ অন্যরকম : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ সমাবেশ সমাচার : ৪৩-৪৪ ◻ খেলা : ৪৫ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৯-৫০

প্রকাশিত হবে
৮ জানুয়ারি,
২০২৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৮ জানুয়ারি,
২০২৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বঙ্গজীবনেও শ্রীরামচন্দ্র অপরিহার্য

মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্র। পরমারাধ্য পুরুষ। দেশময় পূজিত। দৈনন্দিন জীবন, সাহিত্য, নাটক, গান সর্বক্ষেত্রই রাম-ময়। তথাপি কিছু সেকুলার ও তথাকথিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদ শ্রীরামচন্দ্রকে কেবল উত্তর ভারতেই আটকে রাখতে মরিয়া। তিনি নাকি শুধু উত্তর ভারতেরই, শুধু উত্তর ভারতেই নাকি পূজিত হন। বঙ্গজীবনে শ্রীরামচন্দ্রের কোনো প্রভাব নেই।

ইতিহাস কিন্তু তা বলে না। বঙ্গজীবনে শ্রীরামচন্দ্র কিভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছেন সেটা নিয়েই বিস্তারিত পর্যালোচনা থাকবে আগামী সংখ্যার স্বস্তিকায়। লিখবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

নব জাগরণের পুরোধাপুরুষ

অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব হইতেই ভারতবর্ষ তথা বঙ্গপ্রদেশে চলিতেছিল ইসলামের আগ্রাসন এবং খ্রিস্টান মিশনারিদের দ্বারা অবাধ ধর্মান্তরণ। আর ঊনবিংশ শতাব্দীতে শুরু হইয়াছিল ইংরাজের কবলে পড়িয়া হিন্দুধর্মের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা এবং প্রবল হিন্দু বিদ্বেষ। উভয়ের সাঁড়াশি চাপে বঙ্গীয় সমাজ যখন দিশাহারা, ঠিক তখনই কলকাতায় আগমন ঘটিল বঙ্গীয় নবজাগরণের পুরোধাপুরুষ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের। 'চাল-কলা বাঁধা বিদ্যায়' আবদ্ধ না থাকিয়া, দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী মন্দিরের শুধুমাত্র একজন পূজারি না হইয়া তিনি ঈশ্বর লাভের এক নূতন পন্থা আবিষ্কার করিলেন এবং সমস্ত প্রকার কুপ্রথা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ করিয়া সত্য ও প্রেমের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন। সমস্ত প্রকার সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠিয়া ধর্মের নূতন সংজ্ঞা দান করিলেন— ধর্ম কখনো মানুষকে জীবনবিমুখ করে না, বরং মানুষের জীবনকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তোলে। ধর্ম শুধু আচারসর্বস্ব নয়, ধর্ম মানুষকে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ করিয়া তোলে, মানুষের দুঃখ-শোকে ভাগীদার করিয়া তোলে। তিনি সমস্ত উপাসনাপদ্ধতি মন্থন করিয়া সমাজকে অমৃত বিতরণ করিয়াছেন। পুঁথিগত শিক্ষা তাঁহার না থাকিলেও প্রাচ্য ও পাশ্চাতের শিক্ষিত সমাজ তাঁহাকে সাদরে বরণ করিয়াছিল। শিক্ষিত সমাজ তাঁহাকে আধুনিককালের 'সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক' বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, পাশ্চাত্যের মনীষীগণ তাঁহাকে 'শ্রেষ্ঠ ধর্মবিজ্ঞানী' বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। জীবনের অভিজ্ঞতার নিরিখে গ্রামীণ ভাষায় ছোটো ছোটো উদাহরণ তাঁহাকে সাধারণ মানুষ হইতে শিক্ষিত সমাজের নিকট শ্রদ্ধাভাজন করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার মাধ্যমেই তিনি বঙ্গজীবনে এক নিঃশব্দ ভাবান্দোলন সংঘটিত করিয়াছিলেন। তাহা বঙ্গজীবন প্লাবিত করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানীগুণীজনদেরও প্রভাবিত করিয়াছিল। পাশ্চাত্যের নিকট তিনি 'বিস্ময়কর' ব্যক্তি রূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে তিনি ছিলেন ঈশ্বরের এক 'অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার'।

সমাজ পরিবর্তনের যাজ্ঞিক রূপে তাঁহার আবির্ভাব। সেইজন্য প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রনাথকে তিনি চিহ্নিত করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথের মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে 'ষোলোয়ানা' প্রদান করিয়া ভারত তথা বিশ্বের উত্থানের নিমিত্ত নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্য সমুদায় শুধুমাত্র বঙ্গপ্রদেশ নহে, সমগ্র ভারতবর্ষকে অগ্নিমন্ত্রে উদ্দীপিত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন অভিজ্ঞতা 'যত্র জীব তত্র শিব' বাণীকে পাথেয় করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ সেবাধর্মের পথ প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই পাথেয়কে সম্বল করিয়াই স্বামী বিবেকানন্দ 'বনের বেদান্তকে ঘরে' আনিয়াছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দুঃখতাপিত মানুষকে জানাইয়াছিলেন, মানবজীবনের লক্ষ্যই হইল ঈশ্বর লাভ। তিনি সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন, সর্বজীবে একাত্ম হইয়াছেন। সকল ধর্মমতে সাধনা করিয়া ঈশ্বর দর্শন করিয়া বলিয়াছেন 'যত মত তত পথ'। তাহা সত্ত্বেও বলিয়াছেন, সকল ধর্মই সত্য, কিন্তু তাঁহার মা ভবতারিণী ব্যতীত গতি নাই। বলিয়াছেন অন্যান্য ধর্ম আসিবে যাইবে, একমাত্র সনাতন ধর্মই হইল শাশ্বত।

তিনি নারীজাতির জয় ঘোষণা করিয়াছেন। স্বীয় সহধর্মিণী সারদা মাতাকে ষোড়শীরূপে পূজা করিয়া নারীশক্তির উদ্বোধন করিয়া নারীজাতিকে জগজ্জননীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মনে-প্রাণে শুদ্ধ থাকিবার জন্য কামিনী-কাঞ্চনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবার কথা বলিয়াছেন। এহেন অবতারপুরুষ তাঁহার লীলা সংবরণের পূর্বে ইংরাজি ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি কাশীপুর উদ্যানবাটী হইতে সমস্যায় 'কিলবিল' করা কলকাতার 'লোক না পোক'গুলির প্রতি তাঁহার গৃহী ভক্তদিগের মাধ্যমে আশীর্বাদ প্রদান করিলেন— 'তোমাদের চৈতন্য হউক'। তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যের দল সেই চৈতন্য জাগরণের নিমিত্ত দেশময় ছড়াইয়া পড়িলেন। দেশের যুবসমাজকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া স্বাধীনতা আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করিলেন। শ্রীঅরবিন্দ যথার্থই বলিয়াছেন, বঙ্গীয় পুনর্জাগরণে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবই সর্বশ্রেষ্ঠ।

সুভাষিতম্

বিবেকঃ সহ সম্পত্যা বিনয়ো বিদ্যয়া সহ।

প্রভুত্বং প্রশ্রয়োপেতং চিহ্নমেতন্মহাত্মনাম্।।

সম্পদের সঙ্গে বিবেক, বিদ্যার সঙ্গে বিনয় এবং ক্ষমতার সঙ্গে নম্রতাকে একসঙ্গে রাখাই মহৎ ব্যক্তির লক্ষণ।

লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ মোছাবে তৃণমূল শাসিত এই রাজ্যের কদর্য মুখ

‘রেখেছ তৃণমূল করে মানুষ করনি’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

‘উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন। নরকেঽনিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম।। শ্রীমদ্ভগবদগীতা ১। ৪৪। যার কুল আর কুলধর্ম নষ্ট হয়ে গিয়েছে তার অনন্তকাল নরকবাস হয়ে থাকে। রাজ্যের শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের সেই দশা। এই মুহূর্তে তার চির নির্বাসন শ্রেয়। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত পরিবারও বিভিন্ন দুর্নীতিতে অভিযুক্ত। কালিমা লিপ্ত। দলের অনেককেই মমতা তৃণমূল করে রেখেছেন। মানুষ করেননি। মহাভারতের অশ্বত্থামার মতো তাদের অনন্ত নরকবাস তাই প্রায় নিশ্চিত। পরিচিত এক রাজনৈতিক নেতা বললেন, ‘কল্যাণবাবুকে অনুরোধ করুন মমতা আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মিমিক্রি (নকল) করতে। কোনো কংগ্রেস নেতার হিম্মত হবে সোনিয়া বা রাহুল গান্ধীর আড়ষ্ট হিন্দি বলা নকল করতে?।

উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়ের নকল করে তৃণমূলের কদর্য মুখ আবার তুলে ধরেছেন ঘরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশ বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে আগেই সংসদে মুখ পুড়িয়েছিলেন দলের অন্য সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তৃণমূলের সর্বস্তর থেকে কল্যাণবাবুকে ছেঁটে দিয়েছিলেন অভিষেক। তাই অনেকের দাবি ক্লাউন সেজে দলে ফিরতে চাইছেন। ফন্দিফিকির বের করে লোকসভার ভোটে আবার প্রার্থী হতে চাইছেন। শুনেছি লোকসভা ভোটে তৃণমূল ৩৩ থেকে ৪০ শতাংশ নতুন মুখ আনবে। কাটা পড়তে পারে কল্যাণ-সহ অন্য কিছু বৃদ্ধ নেতা। দলের ভিতরেই আলোচনা হচ্ছে কল্যাণবাবু ইচ্ছা করে ভাঁড়ামি করছেন। বহু কদর্যতার ভিডিয়ো নজিরও নাকি রয়েছে শ্রীরামপুরের সাংসদের বিরুদ্ধে। অভিষেকের বিরুদ্ধেও বিষোদ্‌গার করেছেন কল্যাণ।

২০২২-এর ফেব্রুয়ারিতে তাঁকে জাতীয় কমিটি থেকে কেটে দেন অভিষেক। কল্যাণবাবু আর মহুয়ারা নিজেদের কুল নষ্ট করে রাজ্যের সম্মানহানি ঘটাচ্ছেন। তা নিয়ে মমতা আদৌ ভাবিত নন। জাতীয় কংগ্রেসের সুতিকাগৃহে প্রসূত মমতা। প্রতিশোধের সুযোগ পেয়েই নেহরু-গান্ধী পরিবারকে ছেঁটে দিয়ে উটকো আদমি মল্লিকার্জুন খাড়গের নাম প্রধানমন্ত্রীর মুখ হিসেবে প্রস্তাব করেছেন। রাহুল নাকি ইচ্ছা করেই মমতাকে দিয়ে এই কাজ করিয়েছে। রাহুল আর অভিষেকের গোপন বৈঠক হয়েছিল। ২০২৪-এর ভোট বিজেপির কাছে ভারত কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধ। আদর্শ দেশ গঠন

> **মমতাকে ভোট কাটুয়া বলেছিলেন রাহুল। কংগ্রেসে সিপিএমের তরমুজ রয়েছে বলে দল ভেঙেছিলেন মমতা।... আজ মমতাকে ‘ঘোটালা দিদি’ বলে ডাকছেন অন্য রাজ্যের মানুষ।**

করে তাকে ধর্মক্ষেত্রে পরিবর্তন করতে চায় বিজেপি। ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ আর রাজস্থানে ভরাডুবির পর কংগ্রেস বুঝে গিয়েছে পায়ের তলায় মাটি নেই। পরাজয় অনিবার্য।

তাই খাড়গেকেই বলির পাঁঠা করা হয়েছে। চরণ সিংহ, চন্দ্রশেখর, দেবেগৌড়া বা ইন্দর কুমার গুজরাল কখন ভাবেননি তারা ক্বচিৎ প্রধানমন্ত্রী হবেন। মমতাকে ভোট কাটুয়া বলেছিলেন রাহুল। কংগ্রেসে সিপিএমের তরমুজ রয়েছে বলে দল ভেঙেছিলেন মমতা। জাতীয় রাজনীতিতে অবলুপ্ত কমিউনিস্ট সিপিএম আর সিপিআই রাহুলের ধারণা মেনে নিয়েছে। ওটাই কেবল বিজেপি বিরোধিতার অস্ত্র। এই আজগুবি তত্ত্ব প্রমাণ করার নয়। তার আগেই সকলে মহাশূন্যে পাড়ি দেবেন বলেই মনে হয়। বিজেপির ১৭টি রাজ্যে ক্ষমতায় থাকার পাশাপাশি কংগ্রেসের ৩টি রাজ্যে থাকা আক্ষরিক অর্থে ‘নেই বললেই চলে’। এখন মমতার প্রতিশোধের পালা। কংগ্রেসে থেকে বহুদিন ধরে অন্তর্দলীয় প্রতিশোধের রাজনীতি শিখেছেন মমতা। মমতাকে ‘ঘোটালা দিদি’ বলে ডাকছেন অন্য রাজ্যের মানুষ। রাজ্যের রাজনৈতিক বাতাস ‘বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি (২।২২)’--- একরকম ভাবে তাই পুরোনো বস্ত্র পরিত্যাগ করে রাজ্যের মানুষকেও নতুন রাজনৈতিক বস্ত্র পরতে হবে। নতুন শাসন আনতে হবে। ‘ধর্মাদি যুদ্ধাচ্ছেরনং ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে’ (২।৩১) ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মযুদ্ধের থেকে বড়ো আরও কোনো কল্যাণকারী কর্তব্য নেই। □

শীতের সার্কাস মা-মাটি-অমানুষ

উৎসবপ্রিয়াষু দিদি,

বড়দিন আর নতুন বছরের প্রণাম এক সঙ্গেই নিয়ে নেবেন। দিদি, আপনি উৎসব ভালোবাসেন। আমারও ভালো লাগে। এবার শীতে নানা মেলা তো হবেই তার আগে দিল্লিতে যে সার্কাস আপনার নেতৃত্বে উদ্‌যাপিত হলো তার জন্য আরও বেশি করে অভিনন্দন।

বাঙ্গালি শীতে সার্কাস দেখতে ভালোবাসে। আগের মতো না হলেও রাজ্যের এখানে সেখানে সার্কাসের তাবু পড়বে। কিন্তু দিল্লিতে যে সার্কাস আপনি এবং আপনার ভাইয়েরা দেখালেন তাতে বাঙ্গালির আহ্লাদের শেষ নেই। সেই সার্কাসে কংগ্রেস নামক ভারতের বৃদ্ধ দলটিকে নিয়েও আপনি যে ভাবে লোফালুফি খেললেন তার কোনও জবাব নেই।

আপনার দলে জোকারের অভাব কোনও কালেই নেই। কলকাতায় বসে এক জোকার কুণাল ঘোষ আগে বলেছিলেন ২০৩৬ সাল পর্যন্ত আপনি মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন। তারপরে ভাইপো অভিষেক দাদা। তার পরেই মনে হয় আপনি ধমকে ছিলেন। আপনার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছাটায় এই ভাবে জল ঢেলে দেওয়ার কোনও মানে হয়। পরের দিনই ভুল সংশোধন করেছেন তিনি। বলেন, দিদি ঘটনাচক্রে প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলে ভাইপো খুব তাড়াতাড়ি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যাবেন। আপনার অবশ্য তখন আর মুখ ফেরানোর হাল ছিল না।

এর পরে আপনি ঝুলি থেকে একটা মোক্ষম খেলা বের করলেন। সোজা চলে গেলেন আপ নামক দলের (আসলে যেটা এনজিও) কর্তা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের কাছে। দু'জনে মিলে মোক্ষম একটা গুগলি তৈরি করলেন। 'ইন্ডিয়া' নামের যে বাচ্চাটা জন্ম মুহূর্ত থেকে চাইল্ড কেয়ার ইউনিটে ভর্তি তার বৈঠকে চলে গেলেন। দেশের দুই খুদে দল তৃণমূল আর আপ ঠিক করে দিল প্রাচীন কংগ্রেসের মুখ কে হবেন।, নির্দ্বিধায় আপনারা গান্ধী পরিবারের নাম কেটে দিয়ে মল্লিকার্জুন খড়্গে নামক কংগ্রেস কোম্পানির সিইও-কে জোটের মুখ করে দিলেন। খড়্গের অস্বস্তিতে ভরা মুখটা দেখার মতো ছিল বটে! আসন সমঝোতা যে হবে না সেটা আপনি ভালোই জানেন। তবে কংগ্রেসকে নিয়ে লোফালুফি খেলাটা বেশ উপভোগ্য হয়েছে দিদি। বিজেপি অনেকদিন আগেই এককালে ভারতের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা মনে করা কংগ্রেসকে প্রধান বিরোধীদল হওয়ার যোগ্যতা কেড়ে নিয়েছে। আর আপনি কেজরিভাইকে সঙ্গে নিয়ে দেখিয়ে দিলেন, কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রক আপনারা। এটা হয়। নাতিরাই তো একটা সময়ে দাদুর হাত ধরে রাস্তা পার করিয়ে দেয়। শেষ যাত্রাতেও শামিল হয়।

থাক। বিষাদের কথা নয়। আমি সার্কাসের আনন্দ নিয়ে লিখিছিলাম তো! আপনার সার্কাস পার্টির স্লোগানটিকে 'মা-মাটি-অমানুষ' করে দিয়েছেন দলের হেড জোকার কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সংসদ চত্বরে তিনি দেশের দ্বিতীয় সাংবিধানিক প্রধান উপরাষ্ট্রপতিকে যে ভাবে ভ্যাঙালেন তা সত্যিই হাততালি পাওয়ার যোগ্য। অনেকে কাজটা দেখে 'অমানুষ' মন্তব্য করছেন তবে রাহুল গান্ধী করেননি। লোকসভা ভোটে হারার পরে মন খারাপ কমাতে দেখবেন বলে কল্যাণের জোকার-কাণ্ড মোবাইলবন্দি করে রেখেছেন। আহা! এটাই তো মানায় তাঁর মুখে যিনি ঘৃণার বাজারে ভালোবাসার দোকান খোলার কথা বলে বেড়ান।

> **আসন সমঝোতা যে হবে না সেটা আপনি ভালোই জানেন। তবে কংগ্রেসকে নিয়ে লোফালুফি খেলাটা বেশ উপভোগ্য হয়েছে দিদি। বিজেপি অনেকদিন আগেই এককালে ভারতের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা মনে করা কংগ্রেসকে প্রধান বিরোধীদল হওয়ার যোগ্যতা কেড়ে নিয়েছে। আর আপনি কেজরিভাইকে সঙ্গে নিয়ে দেখিয়ে দিলেন, কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রক আপনারা।**

কংগ্রেসই প্রচার করেছিল ভারত জোড়ো যাত্রার পরে অনেকে রাহুল গান্ধীকে ধর্মনিরপেক্ষ উদারবাদী ভারতের পুনঃসম্ভাবনার প্রতীক হিসেবে কল্পনা করেছিলেন। কিন্তু সেই কল্পনা যে একেবারে ভুল তা নিজেই বুঝিয়েছেন রাহুল। জগদীপ ধনখড় দেশের উপরাষ্ট্রপতি। তাঁর শারীরিক সমস্যা নকল করে হাসিঠাট্টার মধ্যে যে ভয়ংকর কুরুচি আপনার ভাই কল্যাণ দেখিয়েছেন দিদি, তার সমান কাজ করে নিজের রুচিবোধ ও অপরিণতমনস্কতা প্রমাণ করেছেন রাহুল গান্ধী। সাধে কি আর তাঁকে দেশ 'পাপ্পু' বলে ডাকে! তিনিই তো ভারতের জোকারকুলের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাস্যাডর!

রাহুল গান্ধী কী করছেন, কেন করছেন, তা তিনি নিজেও জানেন কিনা জানি না। ২০১৩ সালে তিনি নিজের দলের সরকারেরই আনা অধ্যাদেশ লোকসভার ওয়েলে দাঁড়িয়ে ছিঁড়ে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আলিঙ্গন করে নিজের আসনে ফিরে চোখ টিপে অবোধ্য ইঙ্গিত করেছিলেন। একবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির দিকে 'ফ্লাইং কিস' ছুঁড়েছিলেন। 'মোদী' পদবিধারীদের অপমান করেও মুখ পুড়িয়েছেন নিজের এবং দলের। ভারত জানতে চায়, কবে রাহুল 'প্রাপ্তমনস্ক' হবেন?

সুতরাং, দিদি আপনার সার্কাসের ওই খেলাটি সত্যিই দরকার ছিল। রাহুল নয়, খড়্গেই আমাদের মুখ। ৮১ বছরের বৃদ্ধ খড়্গে যতই গান্ধী পরিবারের অনুগত কর্মী হয়ে থাকুন না কেন তিনিও মনে মনে জানেন কংগ্রেস এবং রাহুলের মতোই দিদির জোটের কোনও ভবিষ্যৎ নেই। সবটাই সার্কাস। □

অতিথি কলম

আসিম আলি

একাধিক মুখ থাকতেও প্রকট সিদ্ধান্তহীনতা

সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিকল্পনাহীনতা ও উপযুক্ত নেতৃত্বহীনতার পাকেচক্রে এই বিরোধী পক্ষ সম্পূর্ণ দিশাহীন। শেষমেশ যদি নেতৃত্বের এই বেহাল দশা মুক্ত হয়ে এই জোট অবতীর্ণও হয়, তবে দৈব অনুগ্রহ ব্যতীত উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থাপন তাদের পক্ষে কার্যত অসম্ভব।

দিল্লিতে সম্প্রতি ইন্ডিজোটের বৈঠক ছিল রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে একটি নিষ্ফল প্রচেষ্টা। গত ৩ মাস যাবৎ বিরোধী জোট গঠনের এই প্রক্রিয়া ছিল প্রায় স্থগিত। ৫ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনকে কংগ্রেস পাখির চোখ করার দরুন জোটের কৌশলগত আলাপ-আলোচনা ছিল বন্ধ।

জোট প্রক্রিয়া হারাল গতি : বিধানসভা নির্বাচনে আশাব্যঞ্জক ফলাফল জোটগঠন প্রক্রিয়ার এই গতিহীনতাজনিত ক্ষতিপূরণে হয়তো সহায়ক হতো। নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর দেখা যায়, ইন্ডিজোটের নেতৃস্থানীয় দল কংগ্রেস ৩টি রাজ্যে বিজেপি-র কাছে পর্যুদস্ত হয়েছে। কংগ্রেসের এই শোচনীয় ফলাফলে সমগ্র মধ্য ভারত জুড়ে বিজেপি-র আধিপত্য আজ প্রতিষ্ঠিত। রাজনৈতিক সাফল্য লাভের লক্ষ্যে বিরোধী জোটকে এখন অতিক্রম করতে হবে এক দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত। বিরোধী রাজনৈতিক জোটের প্রতি সান্ত্বনা জানিয়ে, সমবেদনা প্রকাশ করে কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা যাক।

কংগ্রেসের হার ইন্ডিজোটের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ : কংগ্রেসের এই পরাজয়— বিরোধী রাজনীতির পরিসরে আসন রফা সংক্রান্ত রাজনৈতিক সমঝোতায় উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়াটিকে জোট কূটনীতির মারপ্যাঁচে ভিন্নভাবে ত্বরান্বিত করতে পারে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, সদ্য পরাজিত কংগ্রেসের বিনীত ভাবমূর্তির বিপ্রতীপে অতিসক্রিয়, এমনকী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নানাভাবে সোচ্চার জোট শরিকদের পায়ের নীচে এই মুহূর্তে রয়েছে শক্ত জমি। নির্বাচনী ফলপ্রকাশের অব্যবহিত পরেই কংগ্রেসের তরফে বিরোধী জোটের বৈঠকের দিন নির্ধারণ এবং সেখানে যোগদানে সমাজবাদী পার্টি, তৃণমূল কংগ্রেস ও জনতা দল (ইউনাইটেড) নেতৃত্বের অসম্মতি— এই দলগুলির অভাব-অভিযোগের প্রারম্ভিক পর্বের সূচনা করে। কংগ্রেসের একাধিপত্য ও তাদের এই একতরফা ঘোষণার কারণে এই দলগুলির ক্ষোভ প্রকাশ্যে চলে আসে। যদিও পরবর্তী পর্যায়ে, বিশেষত সংসদ থেকে বিরোধী সাংসদদের সাময়িক বহিষ্কারের পর এই জোটের অধিকাংশ দলগুলির তরফে রাজনৈতিক ঐকমত্যের লক্ষ্যে কিছু সদর্থক পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

দাক্ষিণাত্যে শক্তিবৃদ্ধি : দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি রাজ্যে ইন্ডিজোটে সম্প্রতি নতুন গতিসঞ্চার হয়েছে। মরাঠা সংরক্ষণ ইস্যু ও কৃষক আন্দোলনের কারণে মহারাষ্ট্রে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার কিঞ্চিৎ বিপাকে। আগের চেয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল শারদ পাওয়ার ও উদ্ধব ঠাকরে গোষ্ঠী বর্তমানে এই রাজ্যে বিরোধী জোটের প্রধান মুখ হিসেবে পরিগণিত কংগ্রেসের সঙ্গে সব রকমের সংঘাত এড়িয়ে চলছে। গত নির্বাচনে মাত্র ৩টি আসনে জেতা কংগ্রেসের তেলেঙ্গানাতে জয়— তাদের দলীয় শক্তিবৃদ্ধির নির্দেশক। সম্ভবত, এই জয় পাশের রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশে কংগ্রেসের সাফল্য লাভের সম্ভাবনাকে কিঞ্চিৎ উস্কে দেয়।

কর্ণাটকে রাজনৈতিক জটিলতা : জনতা দল (সেকুলার)-এর অন্তর্ভুক্তি এনডিএ জোটকে এই রাজ্যে শক্তিশালী করে তুলেছে। জাতিভিত্তিক জনগণনার মতো রাজনৈতিক কর্মসূচির প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্বদানের কুফল ইতিমধ্যেই প্রকট হয়ে উঠেছে। স্থানীয় স্তরে জাতিগত জনসমীক্ষার বিষয়ে এই রাজ্যের কংগ্রেস সরকার কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। বিজেপি-র পক্ষে রাজ্যের প্রভাবশালী লিঙ্গায়েত ও ভোক্কালিগা সম্প্রদায়ের সমর্থনের ঢল নামার ভয়ে কংগ্রেস ভীত। জাতিগণনার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে--- ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত কংগ্রেস নেতা সিদ্ধারামাইয়া ও ভোক্কালিগা সম্প্রদায়ভুক্ত ডি.কে. শিবকুমারের ভিন্নমতও প্রকাশ্যে এসেছে।

বিহার কেন্দ্রিক উৎফুল্লতা : এসবের মধ্যে বিহার হলো একমাত্র রাজ্য যেখানে প্রধান জোটশরিক--- জেডি(ইউ) ও আরজেডি জাতিভিত্তিক জনগণনার কর্মসূচি রূপায়ণের উদ্দেশ্যে ব্যাপক প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ওবিসি সংরক্ষণ সীমাবৃদ্ধির ইস্যুতে বিহার ও মহারাষ্ট্রের রাজ্য বিজেপি ইউনিটও নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করেছে।

কিন্তু.... ন্যারেটিভের নিতান্তই অভাব : উপরোক্ত বিষয় সমূহই ঘুরে ফিরে বিরোধী জোটের রাজনৈতিক প্রচারাভিযানের মুখ্য প্রতিপাদ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিরোধী পক্ষের প্রধান সমস্যা হলো দেশের নির্বাচকমণ্ডলী অর্থাৎ ভোটদাতারা তাদের তৈরি এই ইন্ডিজোটের মূল ন্যারেটিভ বা রাজনৈতিক বক্তব্য সম্পর্কে বিশেষ অবগত নয়। বিজেপি

সমর্থক ভোটদাতাদের এনডিএ-র প্রচারের প্রধান সুর সম্পর্কে প্রশ্ন করলে— বিশ্বমঞ্চে ভারতের সাম্প্রতিক উত্থান, রামমন্দির নির্মাণ বা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত অসংখ্য জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের বিষয় সমূহ তাঁরা প্রসঙ্গক্রমে তুলে ধরবেন। কিন্তু বিরোধী ঐক্যের যৌথ প্ল্যাটফর্ম হতে প্রচারিত এই জোটের কোনো রাজনৈতিক বার্তার উল্লেখ করতে বিরোধী রাজনীতির সমর্থকরা ব্যর্থ হবেন। বিহার ব্যতিরেকে এই জাতিগত জনগণনার রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা একটি স্লোগানে পর্যবসিত হয়েছে, তৃণমূলস্তরে যার বিন্দুমাত্র প্রভাব নেই।

দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের বিষয়ে হিরণ্ময় নীরবতা : দেশ জুড়ে অস্বাভাবিক দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারত্বের সমস্যা সংক্রান্ত বিষয় তুলে ধরে সাধারণ মানুষকে সচেতন ও সংগঠিত করতে বিরোধী পক্ষ ধারাবাহিকভাবেই ব্যর্থ। মধ্যপ্রদেশ ভিত্তিক সিএসডিএস-লোকনীতির ভোট-পরবর্তী সমীক্ষা অনুযায়ী— অর্ধেকেরও বেশি ভোটদাতা মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারত্ব নিয়ে বিজেপি-র প্রতি অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন। তা সত্ত্বেও ভোটদানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পছন্দ হিসেবে তারা কংগ্রেসের পরিবর্তে বিজেপিকেই বেছে নিয়েছেন।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনাহীনতা : বিজেপি-র তুলনায় কংগ্রেস উন্নততর অর্থনীতি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় সক্ষম— একথা এখনও অনেকেই বিশ্বাস করেন না। ভারতীয় অর্থনীতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণের লক্ষ্যে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো কোনো চিত্তাকর্ষক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ এখনও পর্যন্ত কংগ্রেসের দ্বারা সম্ভবপর হয়নি। এই ধরনের আর্থিক যোজনা তৈরির প্ল্যাটফর্মের অভাবে, জনপ্রতিনিধিত্ব ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রদানের লক্ষ্যে অন্তঃসারশূন্য প্রচার— সমাজের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত ভোটদাতাদের বিজেপি-কে বেছে নেওয়ার পক্ষেই পরোক্ষে সহায়ক হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিপুল জনপ্রিয়তা : ২০১৯ সাল থেকে সব ক'টি ষাণ্মাসিক ইন্ডিয়া টুডে-এমওটিএন সমীক্ষার রিপোর্টে প্রকাশ— শাসক জোট এনডিএ-র ভোটের পরিমাণ অনুযায়ী ন্যূনতম ২৯৮টি আসন তাদের নিশ্চিত। এই সমীক্ষা রিপোর্ট সমূহ শাসক জোটের পক্ষে একটি প্রভাবশালী ও স্থিতিশীল জনভিত্তির আঙ্গিকটিকে তুলে ধরে যা শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, উচ্চবর্ণ সম্প্রদায় ও বিপুল সংখ্যক ওবিসি সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে গঠিত। সিএসডিএস-লোকনীতির সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী মধ্য ভারতের এই তিনটি রাজ্যের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি ভোটদাতা ভারত সরকারের প্রতি তাদের আস্থা ব্যক্ত করেছেন।

নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তা : ২০২৪-এর লক্ষ্যে একটি কার্যকরী রাজনৈতিক প্রচার উপস্থাপনের প্রয়োজনীয় সব বিষয়ে গত ১৯ ডিসেম্বর ইন্ডিজোটের বৈঠকে মিলিত নেতাদের বিশেষ উপলব্ধির প্রয়োজন। বিজেপি দ্বারা প্রেরিত রাজনৈতিক বার্তাটি স্বচ্ছ ও সুসংহত এবং তাদের নেতৃত্ব নিজ সৌকর্যে উদ্ভাসিত। দৃঢ়সংকল্প, বলিষ্ঠ ও যোগ্য নেতৃত্ব— রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সব দিক থেকেই বিজেপি-র প্রাধান্য প্রতিস্থাপন করেছে। জনপ্রিয়তার বিচারে দেশে নরেন্দ্র মোদীর কোনো উপযুক্ত বিকল্প নেতা নেই। রাজ্য সরকারগুলির নির্বাচন অপেক্ষা কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের লক্ষ্যে দেশের সাধারণ নির্বাচন অনেক বেশি রাজনৈতিক নেতৃত্ব কেন্দ্রিক— প্রেসিডেন্সিয়াল চরিত্রের। ২০১৮ সালে ছত্তিশগড় ও রাজস্থানের বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ পরাভূত হলেও, লোকসভা নির্বাচনে ৩৬টি আসনের মধ্যে ৩৪টিতে জয়ী হয়।

শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ভোটদানের অভিপ্রায়ে বিজেপি সমর্থক ভোটদাতাদের এক তৃতীয়াংশ— ২০২৩-এর রাজস্থান বিধানসভা নির্বাচনে ভোটদান করেছেন। আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে, সমাজের বৃহত্তর অংশের সমর্থন— বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোটের অনুকূলে আকর্ষণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রয়াস চালাবেন। ফুটবল ম্যাচের পরিভাষায়, সবাই এখন ম্যাচের শেষ পর্বের, অন্তিম মিনিটগুলির সেই মুহূর্তে উপনীত হয়েছে। যদিও শেষ মুহূর্তে এই বিরোধী জোট অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে, তাদের ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত ছবিটা ফুটে উঠছে। সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিকল্পনাহীনতা ও উপযুক্ত নেতৃত্বহীনতার পাকেচক্রে এই বিরোধী পক্ষ আজ সম্পূর্ণ দিশাহীন। শেষমেশ যদি নেতৃত্বের এই বেহাল দশা মুক্ত হয়ে এই জোট অবতীর্ণও হয়, তবে দৈব অনুগ্রহ ব্যতীত উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থাপন তাদের পক্ষে কার্যত অসম্ভব।

(লেখক একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

শোকসংবাদ

বহরমপুর নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক গোপেন প্রসাদ সিংহা গত ১৮ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। তিনি ন্যাশনাল ল ইয়ার্স ফোরামের রাজ্য কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি তাঁর সহধর্মিণীকে রেখে গেছেন।

* * *

বীরভূম জেলার সিউড়ি নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক অরুণ কুমার সেনগুপ্ত গত ২১ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। ব্যাংকের উচ্চপদস্থ আধিকারিক হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার, কাটোয়া, হাতড়া, নদীয়ায় সঙ্ঘের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। বীরভূমে কল্যাণ আশ্রমের কাজে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য।

* * *

দক্ষিণ কলকাতার প্রবীণ স্বয়ংসেবক লক্ষ্মীনারায়ণ টৌডী গত ১৯ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ছিলেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সঙ্গে যুক্ত থেকে বিভিন্ন সেবাকাজ পরিচালনায় আর্থিক সহযেগিতা করেছেন। তিনি ১ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। তাঁর পুত্র ললিত টৌডী বর্তমানে কলকাতা দেশপ্রিয় ভাগের সঙ্ঘচালকের দায়িত্ব পালন করছেন।

কলকাতায় চূড়ান্ত সফল হিন্দু-পুনরুত্থানের অনুষ্ঠান

গত ২৪ ডিসেম্বর কুয়াশার চাদরে মুড়ে গিয়েছিল কলকাতা। আর তারই মধ্যে কল্লোলিনী কলকাতা সাক্ষী থাকলো ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের। এই আয়োজন কিন্তু কোনো রাজনৈতিক সংগঠন দ্বারা পরিচালিত নয়। অনুষ্ঠান আয়োজনের দায়িত্বে রয়েছে সনাতন সংস্কৃতি পরিষদ, মতিলাল ভারততীর্থ সেবা মিশন আশ্রম এবং অখিল ভারতীয় সংস্কৃত পরিষদ-সহ একাধিক সংগঠন। এবং বলা বাহুল্য যে এটা কোনো রাজনৈতিক কর্মসুচিও নয়, এটা সম্পূর্ণ একটি সাংস্কৃতিক কার্যক্রম। সশরীরে উপস্থিত থাকতে না পারলেও এই মহতী আয়োজনের উদ্যোক্তাদের উদ্দেশে একটি বিশেষ বার্তা পাঠিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ধরা পড়েছিল এর মূল সুরটা। মোদী উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানিয়ে লেখেন : 'এটা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ। মহাভারত, স্বাধীনতা সংগ্রামের পরও বিভিন্ন সময়ে গীতা আমাদের জীবনকে উদ্বুদ্ধ করেছে। গীতা জীবনের অন্যতম চালিকাশক্তি। এক লক্ষ মানুষ কলকাতা একসঙ্গে গীতা পড়বেন জেনে ভালো লাগছে। উদ্যোক্তাদের আমার আন্তরিক অভিনন্দন।'

অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য কলকাতায় আসেন দ্বারকার শঙ্করাচার্য দয়ানন্দ সরস্বতী। মূল মঞ্চে তিনি ছিলেন। ধর্মীয় বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন তিনি। এছাড়াও পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের দ্বৈতাপতি গীতাপাঠের অনুষ্ঠানের মূল মঞ্চে ছিলেন। ব্রিগেডের 'লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ' অনুষ্ঠানে শ্রীমদভগবদ গীতার পাঁচটি অধ্যায় পাঠ করা হয়। গোটা অনুষ্ঠান স্থলকে ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে মোট ২০টি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। প্রতি ভাগে ৫ হাজার জন করে গীতা পাঠ করেন।

সবমিলিয়ে এই আয়োজন দেখে অনেকেই মন্তব্য করেছেন, সেদিনের ব্রিগেডের মাঠ যেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট মনে করিয়ে দিচ্ছিল, বিশেষ করে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবিতে পুরুষেরা ও লালপাড় সাদা শাড়িতে মেয়েদের সহস্রাধিক কণ্ঠে শঙ্খধ্বনি, বেদপাঠ-সহ ইত্যাদি গীতাপাঠের কার্যক্রমে বাঙ্গালির বীররস যেন জাগ্রত হয়েছিল। বিভিন্ন আশ্রমের সাধু-সন্ন্যাসীরা ২৩ ডিসেম্বর রাতের মধ্যেই এসে উপস্থিত হয়েছিলেন কলকাতায়। ২৪ তারিখ সকালে তাঁরা বাবুঘাটে গঙ্গার জল তুলে শোভাযাত্রা করে ব্রিগেডে আসেন। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের ধ্বজ নিয়ে আসা হয়েছিল ব্রিগেডে। বিভিন্ন আশ্রম থেকে আনা হয়েছিল মাটি। খুঁটিপুজো করে আগের দিন থেকে মূলমঞ্চ বানানোর কাজ শুরু হয়। স্বাধীনোত্তরকালে কলকাতার এমন দৃশ্যর সাক্ষী থাকার কথা মনে করতে পারছেন না কেউই।

কিন্তু লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ কর্মযজ্ঞকে কেন্দ্র করে অনভিপ্রেত বিতর্ক পিছু ছাড়েনি। প্রথমত, অরাজনৈতিক সংগঠনের সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে হিসেবে দেখানোর চেষ্টা হতেই যত বিপত্তি। এটা ঠিক যে এই অনুষ্ঠানে বিজেপির নেতা-কর্মী, সাংসদ-বিধায়করা গীতাপাঠের জন্যই অংশ নিয়েছিলেন। এ রাজ্যের শাসক দলের নেতা-নেত্রীদের কেউ এতে অংশ নিতে না বলেনি। তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই অনুষ্ঠানে অংশ নেয়নি বোধহয় এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নাম দেখে এবং সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকের কথা চিন্তা করে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তারা অপ্রচার শুরু করে, লোক হবে জেনে প্রধানমন্ত্রী তাঁর এই সফর বাতিল করেছেন; কিন্তু অনুষ্ঠানের দিন কাতারে কাতারে লোক আসতে দেখেও সারদা-নারদা কাণ্ডে অভিযুক্ত ও কয়েকবছর জেলে থাকা তাদের মুখপাত্র মাত্র সাড়ে তিন হাজার লোক হয়েছে বলে নির্জলা মিথ্যা কথাগুলো না বলে লোক না হাসালেও পারতেন। আবার বাম আমলে হিন্দুদের নির্বীর্য করে রাখার প্রচেষ্টা হাল আমলে মাঠে মারা যেতে বসেছে দেখে অসহ্য রাগে জ্বলতে থাকা বামপন্থীরা আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় হিন্দু গণহত্যার ডাক দিলেন। লালবাজারের সাইবার ক্রাইম বিভাগ অবশ্য সব দেখেও মুখে কুলুপ এঁটেছে।

পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা কিন্তু আর কুলুপ এঁটে বসে থাকবে না। এরাজ্যে শূন্যতে এসে ঠেকার পরও তাদের সমর্থকরা 'জেনারেল ডায়ারের থেরাপি' কিংবা 'তিয়েন আন মেন স্কোয়ার ট্রিটমেন্টে'র হুমকি দেবে, আর হিন্দুরা মৌনীবাবা সেজে থাকবে, এই দিন গেছে। □

সংসদে ‘হামলার’ নেপথ্যে কারা?

সাধন কুমার পাল

সংসদ ভবনে হামলার ঘটনায় আপাতত রাজধানীর রাজনীতি সরগরম। বিরোধীদলের কোনো নেতা-নেত্রীকে এই হামলার নিন্দা করতে দেখা যায়নি। হামলাকারীদের কঠোর শাস্তি জানানোর দাবিও কারও মুখে উচ্চারিত হয়নি। তবে বিরোধীদের বলতে শোনা যাচ্ছে নতুন সংসদ ভবনের চেয়ে পুরনো সংসদ ভবন অনেক বেশি সুরক্ষিত। কারণ সেখানে কোনোদিন দর্শক গ্যালারি থেকে লাফ দেওয়ার ঘটনা ঘটেনি। ২০২১ সালের শীতকালীন অধিবেশন চলার সময় আমার পুরোনো সংসদ ভবনের দর্শক গ্যালারিতে বসে কিছু সময় ধরে সংসদের কর্মকাণ্ড দেখার সুযোগ হয়েছিল। দুই সংসদ ভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থার তুলনা করা দেখে আমার সেই গ্যালারিতে বসার স্মৃতি ফিরে এলো। আমি নতুন সংসদ ভবনের ভিতরে কখনো যাইনি তবে পুরনো সংসদ ভবনের গ্যালারি দেখে এটা মনে হয়েছে ওখান থেকেও লাফ দিয়ে সংসদ ভবনের অধিবেশন স্থলে পৌঁছানো সম্ভব।

সংসদ ভবনের ঢোকার অভিজ্ঞতা থেকে এটা আমার মনে হয়েছে যে সাংসদদের জন্যও নিরাপত্তা তল্লাশির প্রয়োজন রয়েছে। সাংসদরা যখন ঢোকেন তখন তাদের কোনোরকম তল্লাশি করা হয় না। সাংসদদের পকেটে করে পাচার হওয়া মোবাইল নিয়ে তাদের সুপারিশকৃত ভিজিটররা অবাধে মোবাইল নিয়ে সংসদ চত্বরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এই দৃশ্য কিন্তু আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। সেজন্য সাংসদদের পকেটে করে আত্মীয় পরিজনদের মোবাইল ফোন ঢুকতে পারলে অন্য কিছু বিপজ্জনক উপকরণ যে ভবিষ্যতে ঢুকবে না সেই গ্যারান্টি কোথায়?

২০০১ সালের ১৩ ডিসেম্বর সংসদে হামলা চালিয়েছিল সশস্ত্র জঙ্গিরা। ১৩ ডিসেম্বর ২০২৩ বুধবার হঠাৎ তেমনই আতঙ্ক ফিরে এলো নতুন সংসদ ভবনে। লোকসভার ভিজিটরস গ্যালারি থেকে দুটি ক্যানিস্টার নিয়ে সাংসদদের বেঞ্চের দিকে ঝাঁপ দিলেন দুই যুবক। তারপর তারা ক্যানিস্টার খুলে দেন লোকসভার মধ্যেই, যা থেকে গল গল করে ধোঁয়া বা গ্যাস বেরোতে থাকে। এ ঘটনায় হতচকিত হয়ে গিয়ে লোকসভার মধ্যেই দৌড়োদৌড়ি পড়ে যায়। এসময় তারা ‘তানাশাহি নেহি চলেগা’ অর্থ, ‘স্বৈরতন্ত্র চলবে না’ স্লোগান দেয়। পরে তাদের আটক করে পুলিশ। তবে সেদিনের ঘটনাপ্রবাহ দেখে আমার মনে হয়েছে যে এটা ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের ইস্যু তৈরির পূর্ব প্রস্তুতির অঙ্গ।

> **সংসদ সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। জাতীয় নিরাপত্তা এবং জনগণের আস্থা উভয়ের জন্যই সংসদের নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।**

২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে পার্লামেন্ট অভিযানের মতো আরও কত রকমের ঘটনা যে ঘটতে পারে তার আন্দাজ করা মুশকিল। প্রশ্ন হচ্ছে, আমার কেন এরকম মনে হলো? পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনী ফলাফলের পরে বিজেপির বিপুল জয় বিরোধীদের কার্যত অপ্রাসঙ্গিক করে তুলেছিল। বিজেপির জয়ঢাকের আওয়াজের মোকাবিলা করার জন্যও ইস্যুর প্রয়োজন ছিল। ইন্ডিজোটকে যদি প্ল্যান-এ বলা হয় তাহলে টুকরে টুকরে জোটকে প্ল্যান-বি বলতে হবে। পাঁচ রাজ্যে নির্বাচনে প্ল্যান-এ যখন ব্যর্থ হলো স্বাভাবিকভাবেই প্ল্যান-বি-এর মাধ্যমে অ্যাকশন শুরু হয়ে গেল। পার্লামেন্ট ভবনের ভেতরে প্ল্যান-বি এর অ্যাকশনের একটি ছোট্টো ট্রেলার আমরা দেখে ফেললাম। ব্যাস আর যায় কোথায়, ইন্ডি জোটের সামনে একটা বড়ো ইস্যু চলে এল। সংসদ ভবন নিরাপদ নয় তাহলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? সংসদ ভবনে অবৈধভাবে ঢুকে পড়াদের স্লোগানগুলোকে নিয়ে ইন্ডিজোট বাজার গরম করতে মাঠে নেমে গেল। বেকারত্ব, গণতন্ত্রহীনতা নিয়ে প্রবন্ধ, স্লোগান, ব্যানার এগুলো যেন আগেই তৈরি করা ছিল। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই মাঠে নেমে পড়ল। যে সমস্ত প্রবন্ধ খবরে কাগজে দেখা যাচ্ছে সেগুলো যেন অনেক আগে থেকেই লেখা ছিল, প্রকাশিত হওয়া যেন শুধু সময়ের অপেক্ষায় ছিল। প্রতিবাদের ধরন দেখে মনে হচ্ছে এগুলো

ফঃ ২

সবই যেন একটি ইকো সিস্টেমে বাধা। পরিস্থিতি থিতিয়ে আসতেই দেখা যাবে আজকে যারা সংসদের নিরাপত্তা নিয়ে এত হাঙ্গামা করছে সেই একই ব্যক্তি ও দল এই ঘটনায় দোষীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে আন্দোলন শুরু করছে। তবে এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে এই ঘটনার জেরে পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে বিজেপির জয়ঢাকের আওয়াজ সংসদ ভবনের হাঙ্গামার আওয়াজের কাছে অনেকটাই প্রাধান্য হারিয়েছে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে বিরোধীরা অনেকটাই সফল। নিজেদের প্রাসঙ্গিক করে তুলতে বিরোধীরা সংসদে এমন হাঙ্গামা বাধাচ্ছে যে স্পিকার তাদের বহিষ্কার করতে বাধ্য হয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই ইস্যু আরও বড়ো ও দীর্ঘায়িত হচ্ছে। তবে প্রতিবাদের নামে বিরোধীরা সংসদে যে সমস্ত আচার-আচরণ করছেন তাতে জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি হচ্ছে।

অসংসদীয় আচরণের কারণে সংসদ থেকে সাময়িক ভাবে বহিষ্কৃত সাংসদরা গত ১৯ ডিসেম্বর সংসদচত্বরে ধরনা দিচ্ছিলেন যেখানে তাদের ধর্না চলাকালীন একটি ভিডিয়ো সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। সেই ভিডিয়োটিতে দেখা যায় যে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভা সদস্য কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত কুশ্রীভাবে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ও রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়কে নকল করছেন এবং নানা কটূক্তি করছেন। অন্যান্য সাংসদরা সেইসব অঙ্গভঙ্গী ও হাস্যকৌতুক উপভোগ করছেন এবং উল্লাসে ফেটে পড়ছেন। রাহুল গান্ধীকে মোবাইল ফোন বের করে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা সেই অঙ্গভঙ্গীর ভিডিয়োগ্রাফি করতেও দেখা যায়। সংস্কার ও শৃঙ্খলহীন এই সাংসদরা ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পদের গরিমা ও মর্যাদা উপলব্ধিতে আজ ব্যর্থ।

সংসদে নিরাপত্তার বিষয়টি রাজনৈতিক ইস্যু হতে পারে না; এটা সম্পূর্ণভাবেই নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের বিষয়। সংসদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা শুধু বিরোধীদের নয়, শাসকদলের আরও বেশি করে রয়েছে। কারণ শাসক দলে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও অন্যান্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা রয়েছেন যাঁদের নিরাপত্তা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেই জন্য বিরোধীরা সংসদের নিরাপত্তা নিয়ে যা করছেন তাতে মনে হয় না মানুষের কাছে ভালো বার্তা যাবে। সংসদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, সংসদ আমাদের গণতন্ত্রের প্রতীক, একে কলঙ্কিত করার সব ষড়যন্ত্র দমন করতে হবে।

সংসদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সবসময়ই খুব ভালো হওয়া উচিত, কারণ আমাদের সংসদে সন্ত্রাসী হামলাও হয়েছে। এটি আক্রমণকারীদের জন্য একটি হাই প্রোফাইল টার্গেটও। সংসদের জন্য একটি নির্ভুল নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা গুরুত্বপূর্ণ যা হবে যে কোনো অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় সক্ষম। তবে সংসদের নিরাপত্তা আবারও প্রশ্নের মুখে। সংসদের নিরাপত্তা লঙ্ঘন আমাদের নিরাপত্তায় একটি সম্ভাব্য শূন্যতা উন্মোচিত করেছে, যা অবিলম্বে সমাধান করা দরকার। সংসদের নিরাপত্তার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। সংসদ সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা তাদের দায়িত্ব। জাতীয় নিরাপত্তা এবং জনগণের আস্থা উভয়ের জন্যই সংসদের নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন উঠছে নিরাপত্তা কর্মীদের নিয়েও। প্রশ্ন উঠেছে সংসদে মোতায়েন নিরাপত্তা কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি নিয়েও। যে কোনো নিরাপত্তা কার্যকরভাবে মোকাবিলা করার জন্য তাদের যথেষ্ট প্রশিক্ষিত হতে হবে। এ জন্য তাদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

সংসদ সদস্যদের নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নিরাপত্তা কর্মীদের দক্ষতা যাচাই করার জন্য সর্বদা অনুশীলন এবং পরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। সংসদের নিরাপত্তা লঙ্ঘনের কারণে অনেক নতুন উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এই উদ্বেগগুলি সমাধান করা উচিত। সংসদ ভবন ও সংসদ সদস্যদের নিরাপত্তা সরকারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে, নিরাপত্তার কড়াকড়ি করতে গিয়ে যেন সাধারণ মানুষের সংসদের অধিবেশন দেখার সুযোগ বন্ধ হয়ে না যায় সে বিষয়টিও বিবেচনা করতে হবে। ◘

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম- ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

ভারতীয় সংবিধানে হিন্দুস্বার্থ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে

জম্মু-কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা রদ হলো। কিন্তু এখনও আরও কিছু ধারা সংবিধানে বলবৎ রয়েছে যা ভারতের অখণ্ডতা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনগোষ্ঠীর স্বার্থের পরিপন্থী। সেই ধারাগুলোর মধ্যে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার কয়েকটি ধারা বাতিল করেছে এবং আগামীতে দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক ধারাগুলো বিলোপ করা বিশেষ প্রয়োজন।

মণীন্দ্রনাথ সাহা

ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা আছে— 'We the People of India... যা অনেক লম্বাচওড়া কথা দিয়েই শুরু হয়েছিল। সেই ইংরেজি বয়ানের আক্ষরিক অনুবাদ করলে দাঁড়ায়— 'আমরা ভারতের জনগণ এক সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে ভারতের সকল নাগরিকের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ন্যায়বিচার, চিন্তার, বাক্যের, বিশ্বাসের, ধর্মের, উপাসনার স্বাধীনতা; অবস্থান ও সুযোগের সমতা এবং তাদের সকলের মধ্যে সৌভ্রাত্র বৃদ্ধি করে ব্যক্তির মর্যাদা ও জাতির ঐক্য ও সংহতি রক্ষার উদ্দেশ্যে আমাদের গণপরিষদে এই শাসনতন্ত্র গ্রহণ ও প্রণয়ন করে নিজেদের অর্পণ করছি।'

অতি উত্তম কথা। জাতির উল্লেখ নেই, ধর্মের উল্লেখ নেই, নেই কোনও শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের উল্লেখ। এক কথায়— 'উই দ্য পিপ্‌ল অব ইন্ডিয়া--- আমরা ভারতের জনগণ' কথা কয়টিতে একটি সুসংহত ঐক্যবদ্ধ জাতির পরিচয় প্রদান করে।

কিন্তু দেশ ভাগের আগে ও পরে পঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও শিখ নরনারীর রক্তস্রোতে দেশভাগ করে দ্বিজাতিতত্ত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি পেল কংগ্রেস নেতাদের কাছে। বিদ্বেষ বিষে ভরা সেই জাতি-ধ্বংসী নীতিকেই তারা সসম্মানে শাসনতন্ত্রে স্থান দিলেন। 'মাইনোরিটিজম্'

বা সংখ্যালঘুতত্ত্ব যা কোটি কোটি লোকের সোনার সংসার তছনছ করে দিয়েছে। তারা কিন্তু তাই করলেন। দেশকে আবার খণ্ডিত ছিন্নভিন্ন করার বীজ বপন করে গেলেন। ঠিক তেমনি ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ কাশ্মীরকে পুনরায় ভারত থেকে ছেঁটে ফেলার কাজ সুচারুভাবে করার জন্য ৩৭০ ধারা অন্তর্ভুক্ত করে রাখলেন। সেই বিচ্ছিন্নবাদী ধারার বলে রাজ্যের আলাদা সংবিধান, আলাদা পতাকার মাধ্যমে কাশ্মীরকে দেশের মধ্যে আর এক দেশ তৈরি করে সেখানেও সেখানকার ভূমিপুত্র পণ্ডিতদের রক্তে বিপাশা, ঝিলাম, শতদ্রুর জল লালে লাল করে তোলার মদত দিয়ে গেছেন।

দীর্ঘ সত্তর বছর এই পরিস্থিতি চলার পর বর্তমান কেন্দ্র সরকার ৩৭০ ধারাকে বাতিল করে দেয়। তারপর থেকে অশান্ত কাশ্মীর এখন দেশের অন্যান্য অংশের মতো সংবিধানের মান্যতা বহন করে শান্তিতে রয়েছে। কিন্তু বিরোধীরা দেশে সারাবছরই অশান্তি বজায় রাখতে চায় যার জন্য ৩৭০ ধারা বাতিলের বিপক্ষে শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের করে। সেই মামলার রায়দান করা হয়েছে ১১ ডিসেম্বর।

রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে--- 'জম্মু-কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলোপ করার সিদ্ধান্তে কোনও ভুল ছিল না।' ঐতিহাসিক সেই রায়ে সেকথা শুনিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তা সম্পূর্ণভাবে বৈধ ছিল, এমনটাই জানিয়েছেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ। শুধু তাই নয়, সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, 'জম্মু-কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই সাংবিধানিক পদ্ধতিতেই ৩৭০ ধারা বিলোপ করা হয়েছে সেখান থেকে।

এই বিষয়টি নিয়ে শীর্ষ আদালতের ব্যাখ্যা ৩৭০ ধারা একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা ছিল, এটা কখনওই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল না। জম্মু-কাশ্মীর থেকে সংবিধানের ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের জন্য সব রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, এটা জরুরি ছিল না। তাই এই ধারা বিলোপ করতেই পারেন রাষ্ট্রপতি। রীতিমতো সংবিধান মেনেই জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল করেছে কেন্দ্র। তাই সেখানে যাতে দ্রুত বিধানসভা নির্বাচন হয়, সেই নির্দেশ দিয়েছে বেঞ্চ। তবে লাদাখ আপাতত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবেই থাকবে বলে জানিয়েছে শীর্ষ আদালত।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ইতিমধ্যে সংসদে দাবি করেছেন, ৩৭০ ধারা খারিজের পর জম্মু-কাশ্মীরে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। জঙ্গিরা আগের তুলনায় অনেকটাই কোণঠাসা হয়েছে। বহু জঙ্গি মারা গেছে সংঘর্ষে। ভারতীয় সেনাদের দিকে পাথর ছোঁড়ার ঘটনা বন্ধ হয়েছে। বরং কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ এখন নিরাপত্তা বাহিনীকে জঙ্গিদের বিষয়ে খবরাখবর দিচ্ছেন। জঙ্গিজীবন থেকে সরে অনেকে মূল স্রোতে ফিরে এসেছেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে রেকর্ড সংখ্যক মানুষ ভোট দিয়েছেন, যা আগে দেখা যেত না। গণতন্ত্রের প্রতি এই আস্থা উল্লেখযোগ্য। এখন অনেক উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে। পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় এখন রেকর্ড সংখ্যক পর্যটকদের ভিড় বেড়েছে উপত্যকায়। সিনেমা হল খুলেছে। বিতাড়িত কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ফেরানোর কাজ শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের রায় জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখের ভাই-বোনদের জন্য উন্নতি ও ঐক্যের বার্তা। মানুষের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাঁর সরকার।

জম্মু-কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা রদ হলো। কিন্তু এখনও আরও কিছু ধারা সংবিধানে বলবৎ রয়েছে যা ভারতের অখণ্ডতা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনগোষ্ঠীর স্বার্থের পরিপন্থী। সেই ধারাগুলোর মধ্যে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার কয়েকটি ধারা বাতিল করেছে এবং আগামীতে দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক ধারাগুলো বিলোপ করা বিশেষ প্রয়োজন।

আমাদের মনে রাখতে হবে, পৌরাণিক লঙ্কেশ্বর রাবণের কথা। লঙ্কেশ্বর রাবণের মৃত্যুবাণ ছিল তাঁর ঘরে। সবচেয়ে সুরক্ষিত স্থানে। তাঁর স্ত্রীর মন্দোদরীর হেফাজতে। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। সেই নিজের ঘরে থাকা, সুরক্ষিতস্থানে রাখা মৃত্যুবাণেই রাবণের মৃত্যু ঘটল। ভারতীয় সংবিধানেও একটি নয় দুটি মৃত্যুবান রয়েছে হিন্দু, হিন্দুত্ব ও হিন্দুস্থানকে ধ্বংস করতে। সে দুটি হলো— মুসলমানদের জন্য পৃথক শরিয়তি আইন, আর হিন্দুদের জন্য ধর্মনিরপেক্ষতা। আর এই দুটি আত্মঘাতী নীতির যুগ্ম ফল ভারতে পুনরায় ইসলামি শাসনের পথ প্রশস্ত করার পক্ষে যথেষ্ট। তার অশুভ সূচনা শুরু হয়েছে— চোর, জোচ্চোর, জেহাদি, হিন্দুনিধনকারী, ইসলামপ্রেমী, দেশদ্রোহী ও সমাজদ্রোহীরা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠালাভে একজোটে কোমর বেঁধেছে।

আজ প্রত্যেকটি হিন্দুকে সমস্বরে আওয়াজ তুলতে হবে— একদেশে দুই আইন নিপাত যাক, মুসলমান তোষণকারী ধর্মনিরপেক্ষতা ধ্বংস হোক। চোর-গুণ্ডা-চরিত্রহীন-সমাজ শত্রুরা রাজনীতি থেকে দূর হটো। ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণা করতে হবে।

এছাড়াও শতকরা ৭০ জন হিন্দুকে সেকুলারি দলগুলির খপ্পর থেকে বের করে আনতে হবে। সেকুলারি আফিঙের মৌজ ছাড়িয়ে হিন্দু পরিচয়ে মাঠে নামা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তা না হলে দেশ বাঁচবে না, ধর্ম বাঁচবে না, জাতি বাঁচবে না। একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, ৮০০ বছরের ইসলামিক শাসন ও নির্যাতন এবং ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসন যে হিন্দুত্ববোধে আঁচড় কাটতে, আঘাত হানতে পারেনি, মাত্র ৭৬ বছরের সেকুলারি তথা ধর্মনিরপেক্ষ শাসনে সেই হিন্দুত্ববোধকে ভেতর থেকে ঘুণপোকার মতো কুরে কুরে খেয়ে শেষ করে দিচ্ছে। ধর্মহীন হিন্দু সমাজের অবস্থা খাদে পড়া হাতির মতো। তাকে সেকুলারি শেয়াল-কুকুরেরা খাবলে খাবলে খাচ্ছে। তার জন্য ১৯৭৬ সালে জরুরি অবস্থার সুযোগে বিরোধীশূন্য সংসদে হিন্দুস্বার্থ বলিদানকারী--- SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC শব্দগুলো সংবিধান থেকে সরিয়ে ফেলে ভারতকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ার কাজ শুরু করতে হবে। □

চার দশক পর প্রকাশ্যে এল আসল ঘটনা

মোরাদাবাদ দাঙ্গা বাধিয়েছিল মুসলিম লিগ ও কংগ্রেস

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

১৯৮০ সালের ১৩ আগস্ট শুরু হওয়া মোরাদাবাদ দাঙ্গায় কম করেও ৮৩ জন নিহত ও ১১২ জন আহত হয়েছিল। গত বছর মানে ২০২৩-এর আটই আগস্ট, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সেই দাঙ্গার তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন। এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতি এমপি সাক্সেনার এক-সদস্যের তদন্ত আয়োগ ১৯৮৩-র মে মাসে ৪৯৬ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন দাখিল করেছিলেন। কিন্তু সেই প্রতিবেদনটা বিগত ৪ দশক ধরে কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের সরকার চেপে রেখেছিল। এতকাল গল্প চাউড় করা হয়েছিল যে ১৯৮০ সালের আগস্ট মাসের ১৩ তারিখে মোরাদাবাদের ইদগাহে ইদের নমাজ চলাকালীন সেখানে শুয়োর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল আর তা থেকেই হিংসার উৎপত্তি। এই প্রতিবেদন সেই মিথ্যার মুখোশ খুলে দিয়েছে।

প্রতিবেদনে ১৯৮০ সালের দাঙ্গা ও তার প্রতিক্রিয়ায় ক্রমবর্ধিত দাঙ্গার মূল কারণের গভীরে গিয়ে সাব্যস্ত করেছে যে মুসলিম লিগ ও কংগ্রেসের ষড়যন্ত্রের ফল ছিল এই সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা। 'মোরাদাবাদে ইদগাহে ইদের নমাজ চলাকালীন শুয়োর ঢুকেছিল' ---এই গল্পটা পুরোপুরি খারিজ করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে মুসলিম লিগ নেতাদের সমর্থনে একদল মুসলমান দুষ্কৃতী এই গণহত্যার জন্য দায়ী ছিল।

বিচারপতি সাক্সেনার প্রতিবেদনে দাঙ্গার প্রত্যক্ষদর্শী অসংখ্য মুসলমান ও হিন্দু এবং পুলিশ আধিকারিকদের সাক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত আছে। তাতে রাষ্ট্রীয়স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, বিজেপি ও হিন্দুদের সব রকম অপকর্মের থেকে মুক্তি দিয়েছে। পক্ষান্তরে এই হিংসার পুরো দোষ দিয়েছে কিছু মুসলমান ব্যক্তিত্বের অনুসৃত সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে, বিশেষত মুসলিম লিগ ও কংগ্রেস দলের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন। সেই সময়ে কেন্দ্রে ও উত্তর প্রদেশ উভয় জায়গাতে কংগ্রেস সরকার শাসন করত।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মোরাদাবাদ দাঙ্গা শামিম আহমেদ ও হামিদ হোসেন ওরফে আজ্জি ও তার সমর্থকদের নেতৃত্বে মুসলিম লিগের স্থানীয় নেতাদের দ্বারা পূর্ব-পরিকল্পিত ভাবে সংঘটিত হয়েছিল। ড. শামিল আহমেদ উত্তর প্রদেশে ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগকে পুনরুজ্জীবিত করে কংগ্রেসের হাফিজ মহম্মদ সিদ্দিকির সঙ্গে টক্কর দিতে চেষ্টা করছিলেন। প্রতিবেদনে তাঁর এই রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে দায়ী করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে দাঙ্গার সময়ে উপস্থিত ছয়জন হিন্দুর লিখিত জবাববন্দির উল্লেখ করেছে এবং মজার কথা প্রতিটা জবানবন্দিতে উঠে আসে যে গণহত্যা স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না; এটা ছিল আগে থেকে পরিকল্পনা করে করা। প্রতিটা প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্যে শুয়োর ছেড়ে দেওয়ার মুখরোচক গল্পের মুখোশ খুলে দিয়েছে।

মোরাদাবাদের বিজেপির তৎকালীন জেলা সভাপতি হরি ওম শর্মা দাবি করেছেন যে, দাঙ্গাটা ছিল এক বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অঙ্গ। শর্মা তাঁর সাক্ষ্যে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ছড়ানোর জন্য মুসলিম লিগ নেতাদের সাজানো ঘটনাপরম্পরা যা দাঙ্গার আকার ধারণ করেছিল তা বর্ণনা করেছেন।

বিশ্বব্যাপী যত মুসলিম দেশ আছে তাদের থেকে কৌশলগত সহায়তা নিয়ে মুসলিম লিগ, জামিয়াত উলেমা-ই-হিন্দ ও তবলিগি ইসলাম উত্তরপ্রদেশে আলিগড় ও মোরাদাবাদকে ইসলামের আধিপত্য বিস্তার করার অপরিহার্য প্রচারকার্যের অকুস্থল হিসেবে বেছে নিয়েছিল।

বিভিন্ন আরব দেশে পিতলের পণ্য রপ্তানি করে মোরাদাবাদের মুসলমানরা খুব প্রতিপত্তিশালী। মোরাদাবাদ বহুকাল ধরেই পিতলের শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। ইসলামি দেশগুলো মোরাদাবাদকে মুসলমান আধিপত্যবিস্তারকারী অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ওঁত পেতে আছে। এই ইসলামি সংস্থাগুলো আরব দেশসমূহ থেকে কৌশলগত সহায়তা নিয়ে ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে তাদের উপস্থিতি প্রতিষ্ঠিত করতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল; তারা উত্তর প্রদেশের জনতাত্ত্বিক

বিন্যাস বদল করার প্রচেষ্টায় বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত মুসলমানদের অলিগড় ও মোরাদাবাদে বিভিন্ন জায়গায় অনুপ্রবেশ করিয়ে বসতি স্থাপন করতে সহায়তা করছিল। এই ভাবে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মোরাদাবাদে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা খুব সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিজেপি নেতা তাঁর লিখিত জবানিতে ইঙ্গিত দিয়েছেন কীভাবে কংগ্রেস কয়েকটা ছোটোখাটো ঘটনা অতিরঞ্জিত করে ভোটব্যাংক রাজনীতি ও মুসলমান তোষণকে কাজে লাগিয়ে মোরাদাবাদে নির্বাচনকে নিজেদের অনুকূলে আনতে চেয়েছিল। এই ছোটো ঘটনাগুলো তিন মাস আগেই শুরু হয়েছিল এবং শেষমেশ মোরাদাবাদ দাঙ্গায় পরিণত হয়েছিল।

১৯৮০ সালে কংগ্রেস রাজ্য ও কেন্দ্রের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। মোরাদাবাদের রাজনীতিতে ড: শামিম আহমেদ খান মুসলিম লিগকে পুরুজ্জীবিত করে কংগ্রেসের হাফিজ মহম্মদ সিদ্দিকির মোকাবিলা করতে চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৮০ সালের মার্চে মোরাদাবাদের ইন্দিরা চক এলাকার বসিন্দা দলিত সম্প্রদায়ের এক কন্যাকে মহম্মদ রিয়াজের নেতৃত্বে স্থানীয় মুসলমান যুবকরা কিডন্যাপ করে গণধর্ষণ করে। সে একটা বাড়িতে কাজ করার জন্য গিয়েছিল।

ড: শামিম আহমেদ খান মুসলমানদের মধ্যে নিজের প্রভাব বাড়াতে অভিযুক্তদের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। তবে মোরাদাবাদ পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং অনেক কসরত করে দলিত নাবালিকাকে উদ্ধার করে তার পরিবারের হাতে তুলে দেয়। পুলিশের এই সময়োচিত হস্তক্ষেপ ও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ায় স্থানীয় মুসলমানরা এতটাই ক্রুদ্ধ হয়েছিল যে তারা পুলিশ ও দলিত সম্প্রদায়ের উপর প্রতিশোধ তুলতে দাঙ্গার পরিকল্পনা করতে শুরু করল।

বিজেপি নেতা আরও মনে করিয়ে দিয়েছেন, ওই ঘটনা মে মাসে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগে ঘটেছিল। অন্যদিকে কংগ্রেসের হাফিজ মহম্মদ সিদ্দিকি শুধুমাত্র স্থানীয় বিহারি মুসলমানদের সমর্থন জোগাড় করেননি, তিনি বাইরের মুসলমান গুন্ডাদেরও জুটিয়েছিলেন।

৩১ মে ভোটের দিন সিদ্দিকির সমর্থকরা টাউন হলে এক জোরালো শক্তি প্রদর্শন করেছিল। তদের ওখানে উপস্থিত কিছু লোকের মধ্যে হঠাৎ করে মারামারি শুরু হয়ে যায়। সম্ভল ও মিলাক (রামপুর) জেলার মুসলমানরা বস্তুত টাউন হলের বাইরে গোলমাল পাকানোর জন্য সিদ্দিকির সমর্থকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিল। তারা বলেছিল, অভিযুক্তরা সেখানে জড়ো হয়েছিল সিদ্দিকিকে সমর্থন দেওয়ার জন্য। অভিযোগের পরে সিদ্দিকির সমর্থকরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে মোরাদাবাদ টাউন হলের বাইরে ভারতবিরোধী স্লোগান দিতে থাকে— 'আধি রোটি খায়েঙ্গে, পাকিস্তান বনায়েঙ্গে' এবং 'পাঞ্জবিয়োঁকো ভগায়েঙ্গে, নয়া আসাম বনায়েঙ্গে।'

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, বিজেপি নেতা বলেছেন আর একটা ঘটনা হিংসাকে প্রজ্বলিত করেছিল। ১৯৮০ সালের জুন মাসে রাস্তার কোনো এক দুর্ঘটনার ফলশ্রুতিতে জাভেদ নামে এক স্থানীয় গুন্ডা ঠাকুর সম্প্রদায়ের এক সদস্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। তাতে জাভেদ গুরুতর আহত হয়। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে জাভেদকে উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু পথেই সে মারা যায়।

নিজেকে মুসলমানদের সবচেয়ে বড়ো দরদি বলে জাহির করতে শামিম আহমেদ খান এই ঘটনাকেও সাম্প্রদায়িক রং দিতে চেষ্টা করেছিল। প্রচার চালানো হয়েছিল, পুলিশ জাভেদকে খুন করেছে। প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া জাভেদের শবযাত্রা বের করা হয়। শামিম আর এক মুসলিম লিগ নেতা ড: হামিদ হুসেন খান এবং কংগ্রেসে নেতা হাফিজ মহম্মদ সিদ্দিকি অবস্থার সুযোগ নিয়ে মোরাদাবাদের মুসলমানদের খেপাতে থাকে। এক বিশাল মুসলমান জনতা তাণ্ডব শুরু করে দেয়। তারা পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে অবমাননাকর স্লোগান দেয় এবং শহরের বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের ওপর আক্রমণ করে, মারধর করে। উন্মত্ত মুসলমানরা অতিরিক্ত জেলাশাসক ডিপি সিংকে জেলাশাসক ও এসপি-র সামনেই খুন করে। সন্ধ্যাবেলা মুসলমানরা গলশহীদ পুলিশচৌকি আক্রমণ করে তাতে আগুন লাগায়। দুজন পুলিশকর্মীকে হত্যা ক্যর ও অস্ত্রশস্ত্র লুঠ করে। মুসলমান নেতা ও সমর্থকরা শপথ নেয় যে তারা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। ইতিমধ্যে ওই ধর্ষিতা নাবালিকার পরিবার অভিযুক্তের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় সন্ত্রস্ত হয় এবং তাদের মেয়ের জীবনের ভয়ে দ্রুত তার বিয়ের ব্যবস্থা করে।

২৭ জুলাই শহরে সেই মেয়ের বিয়ের দিন বরযাত্রী ইন্দিরা চকে পৌঁছলে মুসলমান গুন্ডারা পাথর ছুঁড়তে শুরু করে, বরযাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। একে পূর্ব পরিকল্পিত আক্রমণ বলে অভিহিত করে বিজেপি নেতা বলেছেন, সশস্ত্র গুন্ডারা দলিত বাল্মীকিদের বাড়িগুলিতে বেছে বেছে আগুন ধরিয়ে দেয়। পুলিশের ভ্যানেও আগুন দেওয়ার চেষ্টা হয়। এই ঘটনায় বাল্মীকি সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকজন সদস্য আহত হন এবং ঘটনাস্থলেও বনওয়ারি নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়। ঘটনার পর দলিত বাল্মীকি সম্প্রদায়ের সদস্যরা মুসলমান গুন্ডাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলেও রাজনৈতিক মদতের কারণে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। আর এক হিন্দু প্রত্যক্ষদর্শী দয়ানন্দ গুপ্ত বলেছেন, বাল্মীকিদের উপর হামলার পর তারা ২৪ জুলাই থেকে মুসলমান বস্তির টয়লেট পরিষ্কার করা বন্ধ করে দেয়। মুসলমানরা রাগের চোটে প্রতিশোধ নিতে বাল্মীকিদের পালিত কিছু শুয়োর বিষ খাইয়ে মেরেছিল। শামিম খান এই ঘটনাতেও মুসলমানদেরই পূর্ণ সমর্থন দিতে এগিয়ে এসেছিল। মোরাদাবাদ আগে থেকেই সাম্প্রদায়িকভাবে সংবেদনশীল ছিল। কিন্তু এই ঘটনায় পরিবেশ অশান্ত হয়ে উঠেছিল। এতে ১৯৮০ সালের ১৩ আগস্ট ইদ উপলক্ষে মুসলিম লিগের ড: শামিম আহমেদ ও হামিদ আনসারি ষড়যন্ত্র করে মুসলমানদের উস্কে দেয়। এর ফলেই তারা বিভিন্ন এলাকায় সহিংস আক্রমণ শুরু করে।

বিজেপি নেতা দাবি করেন, ১৩ আগস্ট যখন সহিংস গণ্ডগোল শুরু হয় তখন মুসলিম লিগ নেতারা নমাজের জন্য ইদগাহে উপস্থিত না হয়ে তাদের শিবিরের আশপাশেই ছিলেন। বিজেপি আধিকারিক বলেছেন, এটা আরও প্রমাণ করে যে এই মুসলমান নেতারা ইদগাহে কী ঘটবে সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কীভাবে শুধুমাত্র দুটো মুসলিম লিগ শিবির রক্ষা পায় যখন বিক্ষুব্ধ জনতা এই অনুষ্ঠানের জন্য ইদগাহের কাছে স্থাপন করা সমস্ত শিবিরে আগুন দিয়েছিল? □

দীনদয়ালজীর রাষ্ট্রবাদী অর্থনীতির সফল প্রয়োগেই দেশ সমৃদ্ধ হচ্ছে

ড. অনিল কুমার ঘোষ

ধর্ম, অর্থ, কাম— এই ত্রিবর্গের লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষের অর্থনৈতিক জীবন পথ পরিক্রমার মধ্যে অর্থ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চাণক্য নীতিতে বলা হয়েছে—সুখস্য মুলম্ ধর্ম, ধর্মস্য মূলম্ অর্থ। তাঁর মতে অর্থ ও কামের ক্রিয়ান্বয়নের মাধ্যমেই ধর্ম প্রকাশিত হয়। প্রাচীনকাল থেকে মানুষ তাই ব্যক্তি ও রাষ্ট্র কল্যাণে অর্থ বা জীবিকার জন্য নীতি নির্ধারণ করে এসেছে। সমাজ গঠনের আগে গোষ্ঠী জীবনে, কৌম ব্যবস্থায় মানুষ প্রাচীন-সমতাযুক্ত অর্থব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। এর মধ্য থেকেই সরকারি ব্যবস্থায়, কৃষি, হস্তশিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে উন্নতি বিধানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সম্পদ বৃদ্ধিকে গুরুত্ব দিয়ে বাণিজ্যযুক্ত অর্থনীতির উদ্ভব ঘটল। সর্বসাধারণের সম্পত্তি মুষ্টিমেয় জনের সম্পত্তিতে পরিণত হলো। কৃষিক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক, সামাজিক বৈষম্য, ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রসারিত হতে থাকল। শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের মাধ্যমে জন্ম নিল সাম্যবাদী অর্থব্যবস্থার ধারণ। এই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে মানুষ নিজেকে, পরিবারকে, সমাজ ও নিজের দেশকে ভালোবাসতে ভুলে গেল। ইতিমধ্যে বিনিময় মাধ্যম হিসেবে টাকাকড়ির উদ্ভব ঘটেছে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার পথ বেয়ে ভূমণ্ডলের দূরতম প্রান্তের ভোগ্যপণ্য আজ হাতের মুঠোয় এসে গেছে। তা সত্ত্বেও আজ তাই মানুষ বড়ো একা হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদের দার্শনিক চিন্তাধারায় গড়ে উঠেছে এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলি। কিন্তু কোনটিই মানুষকে সুখ দিতে পারেনি। পশ্চিমি অর্থনীতিবিদেরা তাই আজ সুখের সূচক বের করেছে, যা দিয়ে পরিমাপ করা হবে মানুষ কতখানি সুখী হতে পারছে বা পারছে না। আসলে শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজ ব্যবস্থায় কোনো বিশেষ শ্রেণীর উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে অর্থনৈতিক তত্ত্ব গড়ে উঠলে তার সুফল কখনই সর্বাত্মক হতে পারে না। তাই মুক্তির পথ খুঁজছে মানুষ। পথ দেখাচ্ছে 'রাষ্ট্রবাদী অর্থনীতি', যার

প্রবক্তা পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়।

দীনদয়ালজীর একাত্ম মানবদর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে রাষ্ট্রবাদী অর্থব্যবস্থা। একে একাত্ম অর্থব্যবস্থা বা মানবকেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থাও বলা হয়ে থাকে। একাত্ম মানবদর্শন হলো তার দার্শনিক রূপ এবং রাষ্ট্রবাদী অর্থনীতি হলো তার প্রায়োগিক রূপ। দীনদয়ালজী চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি এই নয়া দর্শনের সংকল্প বিকশিত করে রাজনীতি ক্ষেত্রে এক যুগানুকূল পথ দেখিয়েছেন। তাঁর চিন্তনের ফসল একান্ত মানবদর্শন একটি সমগ্র দর্শন যেখানে আধুনিক সভ্যতার জটিলতাগুলিকে তার ভাবনার মধ্যে রেখে তারই মধ্যে ভারতীয় বিচারধারার মূল তত্ত্বের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। তিনি মানতেন যে সমাজের অন্তিম পর্যায়ে রয়েছে অতি সাধারণ এক ব্যক্তি যার উপরেই রয়েছে উন্নয়নের সিঁড়ি। এইসব বিবেচনা করে তিনি সাম্যবাদ, সমাজবাদ, পুঁজিবাদ বা সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্বকে সরিয়ে দিয়ে পৃথিবীর বুকে রাষ্ট্রবাদী উপরে গুরুত্ব দিলেন। ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ধারণা বিশ্বের কল্যাণকারী, যেখানে ব্যক্তিসত্তা বসুধৈব কুটুম্বকম্ সংকল্পের আধারে 'সর্বে ভবন্ত সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ'-কেই ব্যক্তি তার অন্তিম লক্ষ্য মনে করে। এই কারণে দীনদয়ালজী একাত্ম মানবদর্শনের ভাবনা রাজনীতিবিদদের সামনে রাখেন। তার ভিত্তিতে উন্নয়নমূলক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে সমাজের অন্তিম পর্যায়ে অবস্থিত ব্যক্তি বিশেষের বিকাশ হবে —এই লক্ষ্য স্থির করতে হবে। যাতে আমরা সেই লক্ষ্যকে বিস্মৃত না হই, তার জন্য তিনি অন্ত্যোদয় যোজনার কথা বলেছেন। সারির সর্বশেষ ব্যক্তির উন্নতি করাই হলো অন্ত্যোদয় যোজনার মূলকথা। বিভিন্ন মতবাদ ও দর্শনের সমন্বয়ে বেরিয়ে এসেছে তাঁর একাত্ম মানবদর্শন যা অন্ত্যোদয় যোজনাকে সাকার রূপ দিতে সহযোগী হয়েছে। দীনদয়ালজী চিতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন–ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন 'স্ব' ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির, সেই মতো বিভিন্ন দেশের নিজ নিজ 'স্ব' রয়েছে, তাকেই তার চিতি বলা হয়। এই 'স্ব' অনুসারেই দেশের ব্যবস্থা, মান্যতা, পরম্পরা, জীবনশৈলী এবং সুখ-দুঃখ সব কিছুই গড়ে ওঠে। সমাজরূপী ব্যক্তির মধ্যে তার শরীর, মন ও বুদ্ধি তথা তার আত্মার অস্তিত্বকে চিহ্নিত করে তার বিকাশের সমুচিত ব্যবস্থা করতে হবে। সেভাবেই নীতি তৈরি এবং তা ক্রিয়ান্বয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবে এই ভাবকে একাত্ম ভাবের সঙ্গে করতে হবে।

> **ভারতের 'স্ব'কে জানতে হবে, তাকে জাগিয়ে তুলতে হবে, গৌরবান্বিত করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বাইরের পুঁজির প্রয়োজন পড়তে পারে তবে তা দেশের 'স্ব' অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের প্রেক্ষাপটেই করতে হবে। এটাই দীনদয়ালজীর ভারতীয় অর্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ।**

দেশকে ভালো না বাসলে দেশের সম্পদের সঠিক ব্যবহার, শ্রম, মূলধনের মতো উৎপাদনের উপকরণের যথাযথ প্রয়োগ ঘটানো যায় না। কারণ মানুষের মানসিক স্থিতি ও চিন্তনশৈলী তাকে দেশের দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন কাজের মাধ্যমে উন্নয়নের কাজে উদ্বুদ্ধ করে।

ব্যষ্টি-সমষ্টি, জনগণ ও সরকার, কথা ও কাজ— এইসব কিছুর মধ্যে সমতা বজায় রাখে ধর্মাচরণ। অভাব ও স্বভাবের মধ্যে সমতাবিধান করে অর্থ। ভোগ ও যোগের মধ্যে সমতা বিধান করে কাম। অন্যদিকে, ইহলোকে একে অপরকে সুখ ও আনন্দ দেবার প্রবৃত্তি তাকে তৈরি করে রাখে মোক্ষ লাভের জন্য। একেই বাস্তবে চতুর্বিধ পুরুষার্থ বলা হয়ে থাকে। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারটি স্তম্ভের উপরেই ভারতীয় চিন্তন স্থাপিত, সেখানে পাশ্চাত্য চিন্তন হলো জড়বাদী যার একমাত্র লক্ষ্য অর্থ। দীনদয়ালজীর মতে ব্যক্তি হোক বা পরিবার, সমাজ হোক কিংবা দেশ বা বিশ্ব, সব ক্ষেত্রেই চিন্তার আধারটি একমুখী না হয়ে একাত্ম হওয়া দরকার।

ভারতের 'স্ব'কে জানতে হবে, তাকে জাগিয়ে তুলতে হবে, গৌরবান্বিত করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বাইরের পুঁজির প্রয়োজন পড়তে পারে তবে তা দেশের 'স্ব' অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের প্রেক্ষাপটেই করতে হবে। এটাই দীনদয়ালজীর ভারতীয় অর্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ।

ভারতে রাষ্ট্রবাদী অর্থনীতির প্রয়োগ সাফল্য দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বিগত এক দশকে। জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রার মান সাম্প্রতিককালে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বেড়েছে। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা- বাণিজ্যে বস্তুগত সাফল্যের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহণ ক্ষেত্রের মতো সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রেও ভারতীয়ত্ব লক্ষণীয় হয়েছে। পরিসংখ্যান দিয়ে বলা যায়, বিগত ৯ বছরে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বেড়েছে ৬৩ শতাংশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে ২০১৪ সালে ৭২৩ থেকে ২০২৩ সালে ১১১৩টি, কলেজ সংখ্যা এই সময়কালে ৩৮৪৯৮ থেকে ৪৩৭৯৬টি, ২০২২-২৩ সালে শিল্প বৃদ্ধির হার ছিল ৫.৬ শতাংশ। বস্তুগত উন্নয়নের পাশাপাশি কাশ্মীরে শান্তি প্রতিষ্ঠা, দেশের মানুষ ন্যায়পরায়ণ হওয়ায় ধর্মাচরণ ও সামাজিক আচরণে স্বাচ্ছন্দ্য পাচ্ছে, শিক্ষায় তাদের 'স্ব' ফিরছে। বিজ্ঞান, সামরিক ও সামগ্রিক অর্থনীতিতে আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, দেশবিরোধী শক্তি দুর্বল হচ্ছে, দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে। দেশ করোনাকালে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধে বসুধৈব কুটুম্বকম্ পালন করেছে। আর এসব সম্ভব হচ্ছে দীনদয়ালজীর দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রবাদী অর্থনীতির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে। আনন্দের বিষয়, দেশ চার ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি অতিক্রম করেছে? □

দেশবিরোধী শক্তিকে উৎসাহিত করাই বিরোধীদের মূল লক্ষ্য

নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে বিরোধী রাজনৈতিক জোটের ডামাডোল ততই প্রকটভাবে ফুটে উঠছে। অধীর চৌধুরীর মমতা বিরোধিতার ফানুস যেমন ফেটে গেছে, ঠিক তেমনই বামপন্থীদের বিপ্লবের স্রোত নবান্নের অভিমুখ পরিবর্তন করে মোদী বিরোধিতায় পর্যবসিত হয়েছে। যদিও এই মুহূর্তে নরেন্দ্র মোদীর বিকল্প কেবল নরেন্দ্র মোদীই, সেকথা আজ সমগ্র দেশ তো বটেই এমনকী সমগ্র পৃথিবীও তা একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছে। আসলে যে কোনো দেশের উন্নয়ন নির্ভর করে সে দেশের সরকারের স্থায়িত্ব ও শক্তিশালী নেতৃত্বের কারণে। আর তাতেই দেশ তার নিজের সংস্কৃতি, স্থাপত্য ও ইতিহাসকে রক্ষা করাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কিন্তু দীর্ঘকাল অবিজেপি সরকার ও দেশের অভিশপ্ত কমিউনিস্টরা বা কংগ্রেস, তৃণমূল-সহ তথাকথিত আইএনডিআইএ -র শরিকেরা এই সত্যকে অস্বীকার করে রোমিলা, থাপার ইরফান হাবিবদের মতো বিকৃত ইতিহাস রচয়িতাদের প্রাধান্য দিয়েছে। অন্যদিকে, ভারতের সংসদের ভেতর যে আক্রমণ হলো তাকে কনডেম না করে বিরোধী দলের সদস্যরা অভব্য আচরণ করে সংসদীয় রাজনীতিতে নজির সৃষ্টি করলেন তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। লোকসভা ও রাজ্যসভার অধ্যক্ষ এই অসভ্য সদস্যদের সাসপেন্ড করে যথার্থ কাজই করেছেন। আর তৃণমূল কংগ্রেস যে একটি সম্পূর্ণ অসভ্য ও বর্বর দল, তা তাদের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরাষ্ট্রপতিকে নিয়ে নোংরা অঙ্গভঙ্গি করা থেকেই প্রমাণিত। রাহুল গান্ধীও এর ভিডিয়ো করে নিজের জাত চেনাতে ভুল করেননি। এই পরিস্থিতিতে আর একটি বিষয় নিয়ে আমাদের বিশেষ করে সতর্ক থাকতে হবে, সেটা হলো যুদ্ধ নয় শান্তি চাই স্লোগানের আড়ালে এই রাজ্যের মাটিতে জেহাদিদের সমর্থন করে বিভিন্ন কর্মসূচির উদ্যোক্তাদের চিহ্নিত করা।

এই সমস্ত দল কখনো হামাস, কখনো অন্য কোনো জঙ্গি হামলা বা জঙ্গি সংগঠকে সমর্থন করে প্রমাণ করেছে যে, দেশের মাটিতে দেশ বিরোধী শক্তিকে উৎসাহিত করাই তাদের মূল লক্ষ্য। তাই আজ একদিকে মানবাধিকার রক্ষা করা যেমন বড়ো চ্যালেঞ্জ, ঠিক অন্যদিকে সনাতনীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া অত্যন্ত জরুরি। গত ২৪ ডিসেম্বর কলকাতার বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউন্ডে লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ এক ঐতিহাসিক কর্মসূচিতে পরিণত হয়েছিল। তারজন্য মানস ভট্টাচার্যকে ধন্যবাদ জানাই।

—**শঙ্কর মণ্ডল,**
খড়্গাপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর।

দেশে জনগণনা বন্ধ রয়েছে কেন?

ইংরেজ আমল থেকেই আমাদের দেশে প্রতি ১০ বছর অন্তর একবার করে জনগণনা করা হতো। কিন্তু ২০১১ সালের জনগণনার পর থেকে কোনও রহস্যজনক কারণে আমাদের দেশে জনগণনা বন্ধ রয়েছে। রহস্যটা কী? জনগণনা হওয়ার কথা ছিল ২০২১ সালে সেটা হয়নি। এরপর ২০২২ সাল এবং ২০২৩ সালেও জনগণনা হয়নি, মনে হচ্ছে হবেও না। কেননা ২০২৩ অতিক্রান্ত হয়ে গেল। ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচন। কাজেই জনগণনার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। এখন প্রশ্ন, রহস্যটা কোথায়? অনেকেই সন্দেহ করছেন, দেশে মিঞাদের সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পেয়েছে, তাদের সংখ্যা সম্ভবত ৪০ শতাংশ। সরকার সেটা প্রকাশিত হতে দিতে চায় না। তাই জনগণনা বন্ধ রাখা হয়েছে। বিষয়টা রহস্যজনক মন হয় না কি?

—**শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,**
বড়বাজার, চন্দননগর।

ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণার যৌক্তিকতা

বহিরাগত হানাদারদের উদ্দেশ্য ছিল, যেভাবেই হোক ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে ছলে-বলে বা কৌশলে সনাতনী হিন্দুদের উৎখাত করা। তাই হানাদাররা বারবার লুণ্ঠন করেছিল সোমনাথ মন্দির, তেমনি সনাতনী সভ্যতার পৃথিবী বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করে অগ্নি সংযোগ করা হয়েছিল, যার মধ্যে লক্ষ লক্ষ পুঁথি পুড়তে সময় লেগেছিল কয়েকমাস।

তাদের সে স্বপ্ন সফল হয়নি, কারণ, সনাতনী হিন্দু এমন এক বিশুদ্ধ আত্মা যাকে ক্ষতবিক্ষত করেও শেষ করা যায় না। যতবারই আক্রমণ করবে ততবারই নবকলেবরে করবে আত্মপ্রকাশ। সনাতনী হিন্দুর সহনশীলতা, তাঁদের শিক্ষা, সংস্কৃতি এতটাই উচ্চমার্গে বিচরণ করছে যে, সেখানে কোনো জেহাদি শক্তি সনাতনী আত্মাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি।

সম্প্রতি, ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আওয়াজ উঠছে, অবিলম্বে ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণা করা হোক। এই দাবিকে নস্যাৎ করতে বহু রাজনৈতিক দল, তথাকথিত সেকুলার বুদ্ধিজীবী মহল 'গেল গেল' রব তুলে প্রতিবাদে মুখর হয়েছে। এদের না আছে কোনো রাজ্যপাট, না কোনো অস্তিত্ব, শুধু বিরোধিতা করার জন্যেই আছে। জনগণকে ভুল বুঝিয়ে হিন্দুরাষ্ট্রের অন্তর্দৃষ্টিকে বিপথে প্রতিষ্ঠিত করার মরিয়া প্রয়াস সৃষ্টি করছে।

সনাতন হিন্দুধর্ম এতটাই প্রাচীন যে আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে রামায়ণ-মহাভারতের যুগেও হিন্দু শব্দের কোনো উল্লেখ ছিল না। 'ভারতবর্ষে' যা কিছু শুভনীতি ও মূল্যবোধ, তার সবকিছুর উৎসই সনাতন হিন্দুধর্ম। ভারত ও হিন্দুস্থান একে অপরের পরিপূরক। এই দেশের অধিবাসীরা সারা বিশ্বের মানুষের কাছে

হিন্দু নামে পরিচিত। স্বামী বিবেকানন্দ দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, 'আমি নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করি।' হিন্দু কোনো সম্প্রদায়গত সংকীর্ণ শব্দ নয়, এর মধ্যে লুকিয়ে আছে বিশ্ববন্দিত অনতিক্রম্য শাশ্বত সৌভ্রাতৃত্ব — 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'।

স্বামী বিবেকানন্দ এই বিচারধারাকে সুন্দরভাবে আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন। ঋষি অরবিন্দ তাঁর ঐতিহাসিক উত্তরপাড়া অভিভাষণে বলেছিলেন, সমগ্র বিশ্বের জন্য চাই সনাতন হিন্দুধর্ম। সমগ্র ভারতবর্ষে এখন বহু প্রতীক্ষিত হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণা করার সব সম্ভাবনা প্রবল হয়েছে।

আর দেরি নয়, জনবিন্যাসের অঙ্কে সনাতনী হিন্দু জনসংখ্যার হার নীচে নেমে গেলে তথাকথিত সেকুলার ভারত আবার জেহাদিদের দখলে চলে যাবে। ভারতের বুকে নেমে আসবে আবার এক অন্ধকার যুগ। সারা বিশ্বে অনেক ধর্মীয় দেশ আছে, তাতে কোনো আপত্তি নেই, শুধু সনাতন হিন্দুরাষ্ট্রই আপত্তি! কেন্দ্রীয় সরকারকে এ ব্যাপারে আরও বেশি সক্রিয় হয়ে জনগণের আকাঙ্ক্ষিত দাবিকে বাস্তবায়িত করতে হবে। অন্যথা ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না, ক্ষমা করবে না আমাদের আগামী প্রজন্ম।

—**ডাঃ দিলীপ কুমার সরকার,**
বিনোবানগর, গুয়াহাটি, অসম।

হিন্দুদের দেবমূর্তি ভেঙে বিজয়দিবস পালন বাংলাদেশে

(১) মহান বিজয় দিবসে ফরিদপুরে আলফাডাঙ্গায় ৩টি স্থানে ৩টি প্রতিমা ভাঙা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে : আলফাডাঙ্গা শ্রীবিষ্ণু পাগল আশ্রম, শ্রীশ্রী দামোদর আখড়া দুর্গামন্দির এবং আলফাডাঙ্গা উপজেলা কেন্দ্রীয় শ্রীশ্রী হরিমন্দির। ঘটনা ১৫ ডিসেম্বর রাতের। বলা হচ্ছে, কট্টরবাদীরা হিন্দুদের দেব-দেবীর মূর্তি ভেঙেই বিজয় দিবস পালন করেছে। সামাজিক মাধ্যমে একজন লিখেছেন, বিজয় দিবসে এটি মেনে নেওয়া যায় না। তাহলে অন্যান্য দিন মূর্তি ভাঙলে তা মানা যায়? যায়, কারণ সেই ১৯৭২ সাল থেকেই মূর্তি ভাঙা চলছে। সবাই মেনে নিচ্ছে, দেখার কেউ নেই। কোনোকালে এর বিচার হয়নি, হওয়ার সম্ভাবনাও নেই!

(২) ১৭ ডিসেম্বর ছিল আরজ আলি মাতুব্বরের জন্মদিন (১৭ ডিসেম্বর ১৯০০— ১৫ মার্চ ১৯৮৫)। তিনি যেসব সত্য কথা বলেছেন, ভাবছিলাম তিনি জীবিত থাকলে এখন কি বলতে পারতেন? বেগম রোকেয়া জীবিত থাকলে কি তিনি যা বলেছেন তা বলতে পারতেন? বেগম রোকেয়া পরাধীন ভারতে এবং আরজ আলি মাতুব্বর ভারত, পাকিস্তান এবং কিছুটা বাংলাদেশ আমলে যেসব সত্য ও মূল্যবান কথা বলেছেন, আজকের বাংলাদেশে এসব সত্য উচ্চারিত হয় না কেন? টরোন্টোর আকবর হোসেন বলেছেন, 'বাংলাদেশের বুদ্ধি-প্রতিবন্ধী সমাজে আরজ আলি মাতুব্বর একটি নীরব বিদ্রোহ।' একজন জানতে চাইলেন, পাকিস্তান আমলেও যে বাক্‌স্বাধীনতা ছিল, এখন তা নেই কেন? এর উত্তর হচ্ছে, 'আগে মানুষ মিথ্যা বলতো না পাপ হবে বলে, আর এখন সত্য বলে না বিপদে পড়বে বলে।

(৩) বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করতে পারুক বা না পারুক, এবার তাঁরা নেতাদের সম্পদের যতটুকু হিসাব দিয়েছেন তাতে এ কথা প্রমাণিত যে, 'দেশ এগিয়ে যাচ্ছে'। গরিবের জন্যে দিনরাত পরিশ্রম করতে করতে নেতারা কোটিপতি হয়ে যাচ্ছেন কিন্তু গরিবরা গরিবই থাকছেন। আরও একটি বিষয় প্রমাণিত যে আমাদের মহিলারাও যথেষ্ট এগিয়ে যাচ্ছেন। কারণ নেতাদেরর চাইতে নেতাদের স্ত্রী'রা অনেক বেশি সম্পদশালী।

—**শীতাংশু গুহ,**
নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।

যেমন ঝাড় তেমন বাঁশ

এই প্রবাদ বাক্যটি এখন পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল তৃণমূলের ক্ষেত্রে একশোভাগ প্রযোজ্য। দলনেত্রীর রুচি অনুসারেই তাঁর সাঙ্গপাঙ্গোরা আচরণ করে চলেছেন। দলনেত্রীর অশুদ্ধ উচ্চারণ, তথ্যহীন উদাহরণ এবং কুরুচিকর অঙ্গভঙ্গি বাঙ্গালিকে লজ্জায় ফেলে দিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের মতো একটি সংস্কৃতিসম্পন্ন রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর এরকম আচরণ অন্য রাজ্যের বাঙ্গালিরা নিজেদের বাঙ্গালি পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করছেন। সম্প্রতি তৃণমূল সাংসদরা দিল্লিতে যে কাণ্ড ঘটালেন বাঙ্গালির মানসম্মান ধুলায় মিশে গেল। তাদের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় উপরাষ্ট্রপতিকে যেভাবে অপমান করেছেন তা সংসদীয় রীতিনীতিকে কলঙ্কিত করেছে। অবশ্য তাদের এক রাজ্যনেতা তথা মন্ত্রী অখিল গিরিও একবার রাষ্ট্রপতির প্রতিও কুরুচিকর মন্তব্য করেছিলেন। এসবই তারা তাদের নেত্রীর কাছ থেকেই শিখেছেন। তাদের নেত্রী তো আগেই প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতির প্রতি কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন। আসলে যেমন ঝাড় তেমনই বাঁশ হয়।

—**প্রতাপাদিত্য সরকার,**
রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

ভুল তথ্য

গত ১৮ ডিসেম্বর স্বস্তিকা পত্রিকায় ৩৮ পৃষ্ঠায় গোপাল চক্রবর্তী মহাশয়ের 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা শুধু ধর্মশাস্ত্র নয়, এক বিশ্বজনীন সাহিত্য' নিবন্ধে লেখা হয়েছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে মার্গশীর্ষ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে মহাবীর অর্জুনকে গীতাজ্ঞান দান করেছিলেন। এটি একেবারে ভুল তথ্য। শুক্লা একাদশী হবে। স্বস্তিকার মতো একটি দায়িত্বশীল পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের প্রুফ ও বানানের প্রতি আরও মনোযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মধুসূদন চক্রবর্তী,
সাহেববাঁধ, পুরুলিয়া।

কার্বন ফুটপ্রিন্ট হ্রাসে মহিলাদের ভূমিকা

সুতপা বসাক ভড়

একদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উন্নতি, অন্যদিকে প্রকৃতি সংরক্ষণ— এই দুটি বিষয়ে সামঞ্জস্য রেখে চলা বর্তমানে খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। আরও দ্বর্থ্যহীন ভাষায় বলা যেতে পারে যে ওই দুটি বিষয়ের সামঞ্জস্য বজায় থাকার ওপরেই নির্ভর করছে আমাদের অস্তিত্ব। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অতি ব্যবহার ও অপব্যবহারের ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে বসেছে— ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাই অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, ভূগর্ভস্থ জলস্তরের নীচে নেমে যাওয়া, বায়ুদূষণ, জলদূষণ, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি। এখনও সময় আছে আমাদের সংশোধন করে নেওয়ার, এজন্য আমাদের কার্বন ফুটপ্রিন্ট হ্রাস করতে হবে।

কার্বন ফুটপ্রিন্ট বলতে বোঝায়, একজন মানুষ বা একটি সমাজ বা একটি দেশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কত পরিমাণ গ্রিনহাউস গ্যাস তাদের জীবনযাত্রার মাধ্যমে তৈরি করছে। সবথেকে উল্লেখযোগ্য গ্রিনহাউস গ্যাস হলো কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও মিথেন। এগুলি পরিবেশের জন্য খুবই ক্ষতিকারক এবং প্রত্যক্ষভাবে বিশ্ব-উষ্ণায়নের জন্য দায়ী। ফলে আবহাওয়ার নেতিবাচক পরিবর্তন যেমন— শৈত্যপ্রবাহ, উষ্ণায়ন, বন্যা ইত্যাদি ঘটে থাকে।

ভারতেও প্রচুর পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। দেশের উন্নতিকল্পে ব্রতী হলেও আমাদের সংস্কৃতি অনুসারে আমরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে যেতে পারি না। সেজন্য ভৌতিক প্রগতি ও উন্নতির সঙ্গে পরিবেশ ও প্রকৃতির প্রতি যত্নশীল হওয়া আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য।

আমরা নিজেদের বাড়ি থেকেই এই কাজে সচেষ্ট হতে পারি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হলো, ট্রেন বাসের ভিড় এড়িয়ে কর্মক্ষেত্রে যাবার জন্য অনেকেই ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার করে থাকেন। ফলে রাস্তায় প্রচুর গাড়ি বহু পরিমাণে গ্রিনহাউস গ্যাস উৎসরণ করে কার্বন ফুটপ্রিন্ট বাড়াতে থাকে। এক্ষেত্রে আমরা 'পুলকার'-এ অর্থাৎ একটি গাড়িতে বেশ কয়েকজন লোক কম খরচে, আরামে, কম গ্রিনহাউস গ্যাস উৎসরণ করে যাতায়াত করতে পারি। এতে অর্থ সাশ্রয় হয়, শারীরিক কষ্ট কম হয় এবং পরিবেশ দূষণের মাত্রা অনেকটাই কমে যায় এবং কার্বন ফুটপ্রিন্ট হ্রাসে সহায়তা করতে পারে।

আবার অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটার অভ্যেস কম করাই বাঞ্ছনীয়। ইচ্ছে হলেই নতুন ফ্যাশনের পোশাক কেনা কম করা প্রয়োজন। প্রয়োজনানুসারে, দেশীয় সংস্থার থেকে কেনাকাটা করা যেতে পারে (Vocal for Local)। আমাদের দেশের পারম্পরিক খাদ্যবস্তু, পোশাক, অত্যাবশ্যক ব্যবহার্য সামগ্রী পরিবেশের অতটা ক্ষতিসাধন করে না। অরগ্যানিক (জৈব উৎপাদন) খাবারের ওপরেও গুরুত্ব দিতে হবে।

একবার মাত্র ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকদ্রব্য বর্জন করতে হবে। বর্তমানে আমাদের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতেও দূষণ পৌঁছে গেছে। সরকার এজন্য কাজ করে চলেছে। তবে দেখা গেছে যে ভারতে প্রতি বছর প্রায় ৩.৪ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক বর্জ্য তৈরি হয় এবং এর মধ্যে মাত্র ৩০ শতাংশ পুনর্ব্যবহার (রিসাইকেল) করা হয়, যা বেশিরভাগই জমি ভরাট করতে (ল্যান্ডফিল) ব্যবহৃত হয়। একবার মাত্র ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক পদার্থ, যেমন— প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ, বোতল, স্ট্র, কাপ--- এগুলি ব্যাপকহারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমরা বাড়ির বাইরে কোনো কাজে যাবার সময় একটি কাপড়ের ছোটো ব্যাগের মধ্যে পুনঃব্যবহারযোগ্য একটি জলের বোতল, কাপ, চামচ ইত্যাদি রাখতে পারি। বাড়ির প্রত্যেক সদস্য এভাবে অভ্যস্ত হলে আমরা সমাজে অন্যদেরও প্রভাবিত করতে পারি।

আবার জঞ্জালের গাড়িতে সব আবর্জনা না ফেলে আমরা আমাদের ব্যবহার করা চায়ের পাতা, ফল, সবজির খোসা ইত্যাদি দিয়ে কম্পোস্ট (জৈব) সার বানাতে পারি। সব দায় সরকারের ওপর না চাপিয়ে নিজেদের সৃষ্ট আবর্জনা নিজেরাই কাজে লাগাতে পারি।

এভাবে ছোটো ছোটো পদক্ষেপ বা প্রচেষ্টা করলে কার্বন ফুটপ্রিন্ট কম হয়ে পরিবেশ দূষণের পরিমান কমাতে পারি।

প্রকৃতিকে শোষণের কোনো অধিকার আমাদের নেই? এই কাজে মহিলারা অগ্রবর্তী হলে সমগ্র পরিবার প্রভাবিত হবে। তাঁরাই হলেন প্রকৃতির সব থেকে কাছের এবং পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু। সুতরাং কার্বন ফুটপ্রিন্ট হ্রাসে মহিলাদের ভূমিকা খুবই আকাঙ্ক্ষিত ও গুরুত্বপূর্ণ। ◻

লিভারের ক্ষতি হয় যে দশটি অভ্যাসে

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

লিভার শরীরের গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ। এটি শরীর ডিটক্সিফাই করে। ঠিক মতো যত্ন না নিলে লিভারের ক্ষতি হয়। এমন দশটি অভ্যাস যা লিভারের ক্ষতি করতে পারে। যেমন— **অত্যধিক অ্যালকোহল সেবন :** অতিরিক্ত অ্যালকোহল সেবনে লিভারের নানাবিধ রোগ হয়, যা ফ্যাটি লিভার থেকে লিভার সিরোসিস পর্যন্ত হতে পারে। লিভার সুস্থ রাখতে চাইলে অ্যালকোহল গ্রহণ বন্ধ করুন।

দুর্বল খাদ্যাভ্যাস : অস্বাস্থ্যকর চর্বি, চিনি এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার খেলে ফ্যাটি লিভারের ঝুঁকি বাড়ে। লিভারের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে খাদ্যতালিকায় সবুজ শাকসবজি, ফল, গোটা শস্য, বাদাম এবং বীজ রাখুন।

ভাইরাল হেপাটাইটিস : হেপাটাইটিস বি এবং সি-এর মতো সংক্রমণ যদি চিকিৎসা না করা হয় তবে দীর্ঘমেয়াদি লিভারের ক্ষতি হতে পারে।

ওষুধ ও সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ : চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো কোনো ওষুধ বা অতিরিক্ত পরিমাণে সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করলে লিভারের ক্ষতি হতে পারে।

ধূমপান : আপনি যদি চেইন স্মোকার হন তবে শুধু আপনার ফুসফুসেরই ক্ষতি করেছেন না লিভারেরও ক্ষতি করছেন। ধূমপান লিভার ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায় এবং লিভারের কার্যকারিতা ব্যাহত করতে পারে।

পরিবেশগত বিষাক্ত পদার্থ : কিছু রাসায়নিক এবং বিষাক্ত পদার্থ লিভারের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে। সেক্ষেত্রে কিছু প্রাকৃতিক প্রতিকার দিয়ে লিভার ডিটক্স নিশ্চিত করুন।

ব্যায়ামের অভাব : সক্রিয় জীবনধারার অভাবে ওজন বেড়ে যেতে পারে। এর ফলে লিভারের সমস্যার ঝুঁকি বাড়তে পারে। এ কারণে আপনার দৈনন্দিন রুটিনে ব্যায়াম অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করুন।

অতিরিক্ত চিনিযুক্ত খাবার গ্রহণ : অতিরিক্ত চিনিযুক্ত খাবার গ্রহণের ফলে নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভারের ঝুঁকি বাড়ে। খাদ্যতালিকা থেকে যতটা সম্ভব চিনি বা মিষ্টিজাতীয় খাবার বাদ দিন।

হাইড্রেশনের অভাব : লিভার ফাংশন-সহ সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্য হাইড্রেটেড থাকা গুরুত্বপূর্ণ। লিভার ভালো রাখতে প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন, ফল ও সবজি খান।

আর্সেনিকাক্রান্ত শিশুর নতুন ঝুঁকি

দুটি সমস্যা : একটি আর্সেনিক, অন্যটি অ্যান্টিবায়োটিকের অকার্যকারিতা। উভয় সমস্যাই মারাত্মক। একটির প্রভাবে আরেকটি আরও সাঙ্ঘাতিক হয়ে উঠতে পারে। শিশুদের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিকের অকার্যকারিতায় অন্যতম কারণ আর্সেনিক। আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র-আইসিডিডিআর, বির গবেষণায় বিষয়টি দেখা গেছে। গ্রামাঞ্চলে জলে আর্সেনিকের মাত্রা বেশি এমন এলাকায় শিশুদের মল ও জলে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী ইকোলাইয়ের উচ্চ প্রাদুর্ভাব পেয়েছে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, কম আর্সেনিকযুক্ত অঞ্চলের তুলনায় খাবার জলেতে আর্সেনিক দূষণের মাত্রা বেশি, এমন এলাকায় অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধের মাত্রাও বেশি।

সাধারণভাবে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ বা অকার্যকারিতার কারণ অ্যান্টিবায়োটিকের অত্যধিক ব্যবহার এবং অব্যবহার। অনেকে শিশুকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই এটি খাওয়ানো শুরু করেন। আবার কোনো কোনো চিকিৎসক শিশুর কিছু হলেই অ্যান্টিবায়োটিক ধরিয়ে দেন। এটি জীবন রক্ষাকারী ওষুধটির অত্যধিক ব্যবহারের একটি দিক। আর অপব্যবহারের দিকটি হলো, অ্যান্টিবায়োটিক নির্দিষ্ট ডোজ মেনে খেতে হয়। চিকিৎসক যদি সাত দিন তিনবার খাওয়াতে বলেন, সেখানে ২১ বারের একবারও অনিয়ম করা যাবে না। একবার না খেলেও সেটি কার্যকারিতা হারাবে।

এছাড়াও রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন

সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেই দৌড়াতে হয় অফিসে। মেজাজ অনেক সময় ধরে রাখতে কষ্ট হয়। কখনও বসের ওপর কখনও সহকর্মীর ওপর অল্পতেই মাথা গরম হয়ে যায়। কখনও কখনও পরিস্থিতি এতটাই বাইরে চলে যায়, রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয় না একেবারেই। কাজের ক্ষেত্রে রাগারাগি হতেই পারে। সেই রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারলে ক্ষতি কিন্তু আপনারই। ◘

প্রেমবিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য চরিত্রের মধ্যে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন দিকের বিকাশ লক্ষ্য করেছেন। কেউ বলেছেন তিনি অবতার, কেউ বলেছেন মহাপুরুষ, কেউ-বা বলেছেন সাধক। এই দিব্য চরিত্রের মধ্যে কেউ খুঁজে পেয়েছেন জমাট আধ্যাত্মিকতা, কেউ দেখতে পেয়েছেন একটি বৈজ্ঞানিক মন, কেউ দেখেছেন দার্শনিক যুক্তিবাদ, আবার কেউ লক্ষ্য করেছেন সংবেদনশীল মাতৃহৃদয়। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন : 'এল-ও-ভি-ই (Love) Personified'— মূর্তিমান প্রেম। তিনি আরও বলেছেন : 'ঠাকুরের এই ভালোবাসাই আমাকে চিরকালের মতো বাঁধিয়া ফেলিয়াছে— একা তিনিই ভালোবাসিতে জানিতেন ও পারিতেন— সংসারের অন্য সকলে স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভালোবাসার ভানমাত্র করিয়া থাকে'। নিম্নবর্ণিত কয়েকটি ঘটনার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের এই সর্বগ্রাসী প্রেমের আভাস পাওয়া যাবে।

পূর্ণচন্দ্র স্কুলের ছাত্র। একদিন সন্ধ্যাবেলায় সে যথারীতি পড়ার ঘরে গিয়ে পাঠে মন দিয়েছে। ঘরে দ্বিতীয় কেউ নেই। ক্রমে ঘন অন্ধকার নেমে এল। হঠাৎ সে বাইরে জানালার সামনে দেখল কে যেন দাঁড়িয়ে। পূর্ণ কিন্তু ভয় পেল না, কারণ তার চিনতে দেরি হলো না, আগন্তুক আর কেউ নন— তারই বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। যাঁর নিকট সে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে জেনেছে। যাঁর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের অপার অকৃত্রিম স্নেহে আপ্লুত হয়েছে। মহেন্দ্রনাথ মৃদুস্বরে পূর্ণকে বললেন : 'ঠাকুর শ্যামপুকুরে তোমার জন্য প্রতীক্ষা করছেন— সঙ্গে এস'। তখনই পূর্ণ মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে সেখানে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। ঠাকুর তাঁর প্রাণপ্রিয় বালক শিষ্যকে বাহুপাশে আবদ্ধ করে বললেন : 'তোর জন্য সন্দেশ এনেছি, তুই খা'। স্বহস্তে পূর্ণকে খাইয়ে দিয়ে ঠাকুর শান্ত ও তৃপ্ত হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন, পূর্ণের দক্ষিণেশ্বরে আসা তার বাবা পছন্দ করেন না। তাই তিনি নিজেই ক্লেশ স্বীকার করে রাত্রে কলকাতায় এসেছেন তাঁর প্রিয় এই বালকভক্তকে দেখতে ও সাধন সম্বন্ধীয় উপদেশ দিতে। শ্রীরামকৃষ্ণের এই অহৈতুকী কৃপাতেই পূর্ণচন্দ্র তাঁর নিকট চিরবদ্ধ হয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ অভিনয় দেখতে কলকাতায় এসেছেন। অভিনেতাদের মধ্যে অন্যতম গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তিনি নেশার ঘোরে ঠাকুরের কাছে আবদার করে বললেন : 'তুমি আমার ছেলে হবে বলো'। ঠাকুর জানালেন, তাঁর বাবা ছিলেন শুদ্ধসত্ত্ব ব্রাহ্মণ। তিনি কেন গিরিশের ছেলে হতে যাবেন? নেশাগ্রস্ত গিরিশ ক্রুদ্ধ হলেন। যথেচ্ছ গালাগালি দিয়ে সকলের সামনে ঠাকুরকে অপমানিত করলেন। ভক্তরা তাঁকে পরামর্শ দিলেন তিনি যেন আর কখনও গিরিশের নিকট না যান। এদিকে পরের দিন নেশার ঘোর ঘাটলে গিরিশ তাঁর কৃতকর্মের জন্য অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। অনুতাপানলে দগ্ধ হয়ে আহারাদি পর্যন্ত ত্যাগ করলেন। অপরদিকে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে ঠাকুরের মনেও শান্তি নেই। অন্তর্যামী ঠাকুর গিরিশের পরিবর্তিত মনোভাব বুঝতে পারলেন। স্থির থাকতে না পেরে ছুটে এলেন গিরিশের বাড়িতে। আত্মগ্লানিরূপ দাবদাহে গিরিশের হৃদয় তখন জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরকে দেখেই তিনি লুটিয়ে পড়লেন তাঁর পাদমূলে। বললেন— 'আজ যদি তুমি না আসতে, ঠাকুর, তাহলে বুঝতুম, তুমি এখনও নিন্দাস্তুতিকে সমান জ্ঞান করতে পারনি --- তোমার পরমহংস নামে অধিকার আসেনি। আজ বুঝেছি তুমি সেই'। গিরিশ চিরদিনের মতো নিজেকে সমর্পণ করলেন ঠাকুরের চরণপ্রান্তে। অচিরেই তিনি সর্বপ্রকার দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়ে ভক্ত ভৈরবে রূপান্তরিত হলেন।

মৃড়াণী (পরবর্তীকালে গৌরীমা) বাল্যকাল থেকেই ধর্মানুরাগিনী ও স্বাধীনচেতা। বিয়ের প্রস্তাব এল— তিনি অসম্মত হয়ে বললেন, 'তেমন বরকেই বিবাহ করিবেন যাহার মৃত্যু নেই'। তা সত্ত্বেও বিয়ে স্থির হলো। নির্দিষ্ট লগ্নে তাঁকে গৃহে পাওয়া গেল না। বৈবাহিক বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি লাভের দ্বিতীয় কোনো পথ না পেয়ে তিনি ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। তাঁর একমাত্র ব্রত দামোদর নামধারী নারায়ণশিলাকে জীবন মন অর্পণ

করে ধন্য হবেন— কোনো মনুষ্যপতি গ্রহণ করবেন না। তাছাড়া তীর্থভ্রমণস্পৃহাও ছিল তাঁর জীবনে অদম্য। তাই তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে মুণ্ডিত মস্তকে, কখনও পাগলিনীর রূপ ধরে, কখনও-বা আলখাল্লা ও পাগড়ি পরিহিত পুরুষের বেশে অসীম উৎসাহে ভারতের নানা তীর্থ ঘুরে বেড়িয়েছেন। নারায়ণশিলাকে পতিত্বে বরণ করে তাঁর আরাধনায় সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন। একবার তাঁর কলকাতায় বলরাম ভবনে অবস্থানকালে বলরামবাবু দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য অনুরোধ জানালেন। উত্তরে গৌরীমা বললেন, জীবনে অনেক সাধুদর্শন হয়েছে দাদা, নতুন কোনো সাধু দর্শনের সাধ আমার নেই। তোমার সাধুর যদি ক্ষমতা থাকে আমায় টেনে নিয়ে যান— তার আগে আমি যাচ্ছিনে'।

অল্পদিনের মধ্যেই অপ্রত্যাশিত ভাবে সে টান এল। সেদিন গৌরীমা দামোদরকে আসনে বসাতে গিয়ে দেখেন সেখানে অবয়বহীন দুটি মনুষ্যচরণ। প্রথমে ভাবলেন, এ চোখের ভ্রম। কিন্তু স্বচ্ছ দৃষ্টিতে পুনরায় পরীক্ষা করে দেখলেন এ ভ্রান্তি নয়। তুলসীপত্র নিবেদন করতে গিয়েও দেখেন সে তুলসীপত্র গিয়ে স্থানলাভ করেছে ওই চরণযুগলে। গৌরীমা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তিন-চার ঘণ্টা পর জ্ঞান ফিরে এল। কিন্তু কোনো কথা বলতে সমর্থ হলেন না। কেবল তাঁর মনে হতে লাগল কে যেন তাঁর হৃদয়তন্ত্রীকে সুতোয় বেঁধে আকর্ষণ করছে। ভোর না হতেই গৌরীমা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। কোথায় যাচ্ছেন কেউ বুঝতে পারলেন না। বলরামবাবু এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'দিদি দক্ষিণেশ্বরে মহাপুরুষের কাছে যাবে? গৌরীমা নিরুত্তর রইলেন। বলরামবাবুর বুঝতে বাকি রইল না তাঁর এ মৌনতা সম্মতিরই নামান্তর। শীঘ্র গাড়ি ডাকা হলো। বলরামবাবু সস্ত্রীক গৌরীমাকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হলেন। সকলে দেখতে পেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ আপন মনে সুতো জড়াচ্ছেন। যেমনি তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে প্রবেশ করলেন তখনই তাঁর সুতো জড়ানো শেষ হলো। গৌরীমার সে অজ্ঞাত টানেরও অবসান ঘটল। তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না যখন তিনি দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণের চরণযুগলই তাঁর পূর্বদৃষ্ট তুলসীপত্র শোভিত চরণদ্বয়। এভাবেই গৌরীমাকে শ্রীরামকৃষ্ণ টেনে নিয়েছিলেন স্বীয় ভক্তপরিমণ্ডলের মধ্যে।

মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছেন। কাশী বৃন্দাবনের পথে তারা বৈদ্যনাথ ধামে এসে উপস্থিত হয়েছে। একদিন এক দরিদ্রপল্লীর ভেতর দিয়ে হেঁটে চলেছে। কারও মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। ঠাকুর কিন্তু সেখানকার মানুষের দুর্দশা দেখে স্থির থাকতে পারলেন না। করুণায় বিগলিত হলো তাঁর প্রেমপূর্ণ হৃদয়। মথুরকে ডেকে তিনি বললেন, 'তুমি তো মায়ের দেওয়ান। এদের এক মাথা করে তেল ও একখানা করে কাপড় দাও, আর পেটটা ভরে একদিন খাইয়ে দাও'। মথুরবাবু বললেন, 'তীর্থে অনেক খরচ হবে, এও দেখছি অনেকগুলি লোক, এদের খাওয়াতে দাওয়াতে গেলে টাকার অনটন হয়ে পড়তে পারে, এ অবস্থায় কী বলেন'? ঠাকুর কোনো কথাই শুনলেন না। গ্রামবাসীদের কষ্টের কথা ভেবে কেবল অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। মথুরের মনে দ্বিধা দেখে তাঁর করুণার্দ্র মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তিনি বললেন, 'দূর শালা, তোর কাশী আমি যাব না। আমি এদের কাছেই থাকব, এদের কেউ নেই, এদের ছেড়ে যাব না'। দুঃখে অভিমানে তিনি গিয়ে গ্রামের দরিদ্রদের মধ্যে বসে পড়লেন। উপায়ান্তর না দেখে মথুর কলকাতা থেকে কাপড় আনিয়ে ঠাকুরের কথামত সব কাজ করলেন। গ্রামবাসীদের মুখে হাসি ফুটে উঠল। ঠাকুরও সানন্দে মথুরবাবুর সঙ্গে কাশী যাত্রা করলেন।

সারদার (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ) তখন অল্প বয়স। বাস্তববাদী ও যুক্তিবাদী সাধারণ যুবকদের মতো তিনিও ভূতের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী। তিনি জানতে পারলেন— মধ্যরাত্রে কোনো এক পরিত্যক্ত বাড়িতে রাত্রিবাস করলে নিশ্চিত ভূত দেখা যায়। কৌতূহল মেটাতে সাহসী সারদা এক রাত্রে একাকী সে বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। মাঝরাত এসে গেল কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। তিনি হতাশ হয়ে পড়লেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন, ঘরের কোণে একটি ক্ষীণ আলোর বিন্দু। ক্রমে তা উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর মধ্য থেকে একটি ভীষণাকার চোখ তার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। সারদার সমস্ত শরীর শিউরে উঠল। তিনি প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। এমন সময় দেখতে পেলেন, সম্মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ দণ্ডায়মান। তিনি বললেন, 'বৎস যে কাজে মৃত্যু নিশ্চিত, সে সব কাজ বোকার মতো কেন কর? আমার প্রতি মন রাখলেই যথেষ্ট হবে'।

বরাহনগরেও সারদা এক রাত্রে ব্রহ্মানন্দ ও সুবোধানন্দ মহারাজের সঙ্গে এক শয্যায় শুয়ে আছেন। হঠাৎ তাঁর ইচ্ছা হলো শ্মশানে গিয়ে তন্ত্রসাধনা করবেন। নিঃশব্দে তিনি ঘর থেকে বেরুতে গেলেই ঘুমের ঘোরে ব্রহ্মানন্দ চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'ওরে সারদা যাসনি, যাসনি'। সারদা স্তম্ভিত হয়ে বহির্গমনে নির্বৃত্ত হলেন। ব্যাপার জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বপ্নে দর্শন দিয়ে ব্রহ্মানন্দকে বলছেন— তিনি যেন সারদাকে এরূপ কর্ম হতে নির্বৃত্ত করেন। তন্ত্রসাধনায় একদিকে যেমন বিপদের আশঙ্কা তেমনি পতনেরও ভয় থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে এ সাধনায় সিদ্ধ হলেও এসব পছন্দ করতেন না। এক্ষেত্রে মর্ত্যলীলা ত্যাগের পরও ঠাকুর তাঁর সন্তানদের সর্বদা রক্ষা করছেন দেখে সকলে অভিভূত হলেন। অপর এক সময়েও সারদা একটি ভঙ্গুর বাঁধের উপর দিয়ে রাত্রে এক পার্বত্য নদী পার হচ্ছেন। হঠাৎ একখণ্ড কালোমেঘ এসে স্থানটি ঘিরে ফেলল। ঘন অন্ধকারে কিছু দেখতে না পেয়ে তিনি মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগলেন আর স্মরণ করতে লাগলেন পরম কারুণিক শ্রীরামকৃষ্ণের কথা। এমন সময় শুনতে পেলেন এক অশরীরী বাণী 'আমার অনুসরণ কর্'। সে শব্দ লক্ষ্য করে সারদা এগিয়ে গেলেন। রক্ষা পেলেন নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে।

ঠাকুরের অপার্থিব প্রেমের কথা বুঝতে গিয়ে স্বামী প্রেমানন্দ বলেছেন, 'আহা ঠাকুর আমাদের কত ভালোবাসতেন।... কোনো কোনো দিন রাত্রে তাঁকে হাওয়া করতে করতে আমি ঘুমিয়ে পড়তুম; তিনি আমাকে তাঁর মশারির ভেতর নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিতেন। আমি আপত্তি করতুম, কারণ তাঁর বিছানা আমার ব্যবহার করা কি ঠিক? তাতে তিনি বলতেন, বাহিরে তোকে মশায় কামড়াবে; যখন দরকার হবে আমি জাগিয়ে দেব'।

(লেখক স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক বাসভবন ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সম্পাদক)

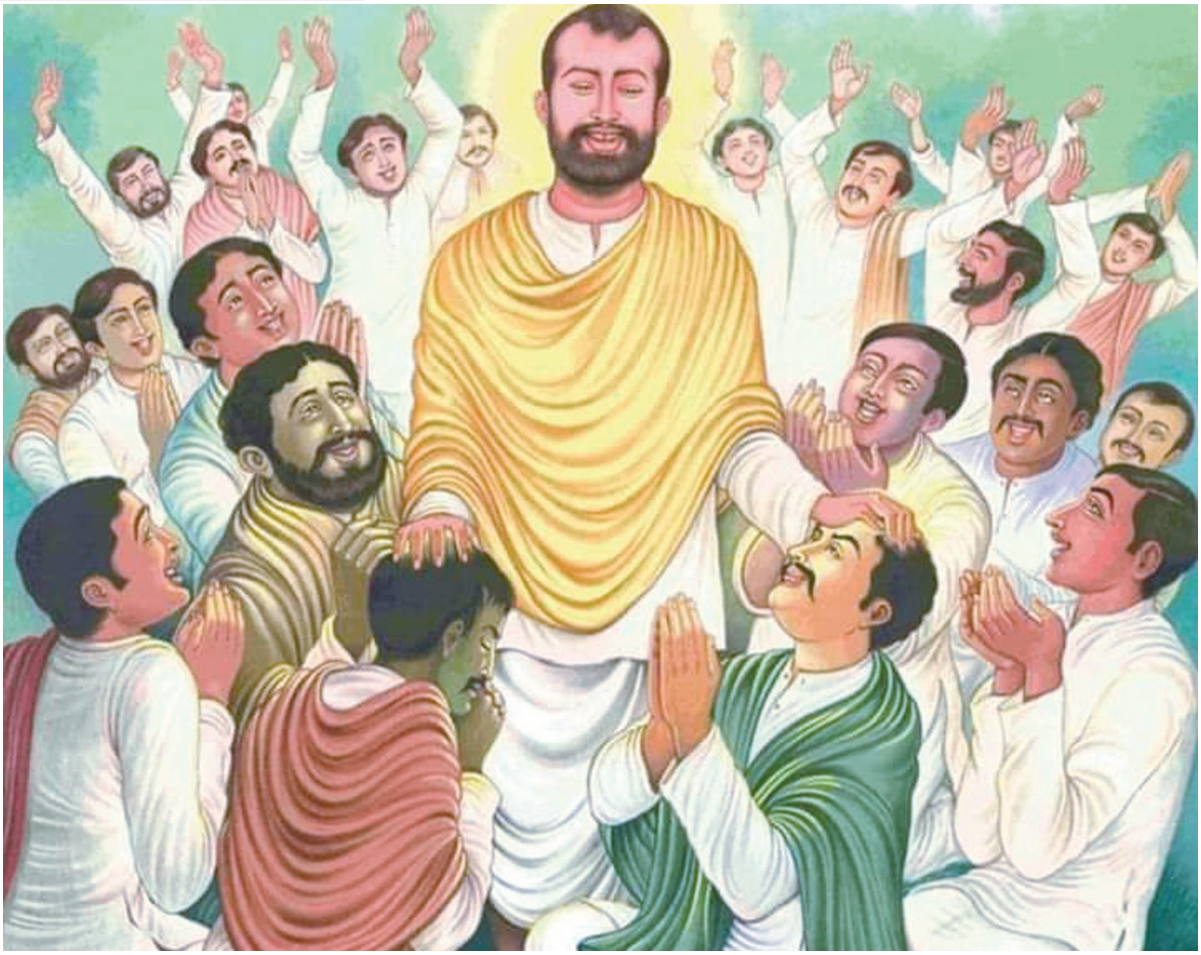

ভক্ত ও ভগবান : শ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যানে

স্বামী আত্মবোধানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের যাঁরা অন্তরঙ্গ, ঠাকুরের সন্তানরা, তাঁরাও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু বলতে ইতস্তত বোধ করতেন। কেন করতেন? আসলে তিনি এতো বড়ো যে, তাঁর ইতি করা যায় না। অর্থাৎ তাঁর কোথায় শুরু কোথায় শেষ কিছুই উদ্ধার করা যায় না। কথামৃত পড়ার সময় মনে হয় ঠাকুর যা বলছেন, এ-সব তো সহজ ব্যাপার। আধ্যাত্মিক জগতের কথা তো বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায়, যত সহজ ভাবি তত সহজ নয়। সমাজসেবক অশ্বিনীকুমার দত্ত বলেছিলেন, 'সামনে কথা বললে মনে হতো এক ক্লাসের বন্ধু। পরে মনে হয়, ওরে বাপরে! কার কাছে গেছলাম।' একবার স্বামী বিবেকানন্দকে গিরিশচন্দ্র অনুরোধ করে বললেন, 'ভাই, তুমি ঠাকুরের একটা জীবনী লেখ।' স্বামীজী হাতজোড় করে গিরিশচন্দ্রকে বলেছিলেন— 'জি.সি. তুমি আর যে কোনো আদেশ কর, আমি করবো, কিন্তু এ আদেশ করো না। ও আমি পারব না। শেষকালে কি শিব গড়তে বানর গড়ব?' নরঋষি স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অপারগতা প্রকাশ করছেন— ঠাকুর সত্যি সত্যিই আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

উপনিষদে আমরা দেখি ব্রহ্ম সম্বন্ধে কতরকম অদ্ভুত পরস্পর-বিরোধী সব কথা বলা হচ্ছে। একবার বলা হচ্ছে, 'তদেজতি তন্নৈজতি'— তিনি চলেন আবার চলেনও না। 'তদ্দূরে তদ্বন্তিকে— তিনি দূরে আছেন আবার কাছেও আছেন। 'তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ— সকলের অন্তরে আছেন তিনি, আবার বাইরেও আছেন (ঈশোপনিষদ, ৫)। আসলে ভগবান এত বড়ো তিনি 'অবাঙ্‌মানসগোচর'। তিনি সব আইনের ঊর্ধ্বে— কোনো কিছু দিয়েই তাঁকে বাঁধা যায় না অথবা ব্যক্ত করা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ একটা গল্প বলতেন : 'নারদ আসছেন ভগবানের কাছ থেকে। রাস্তায় দু'জন লোক তাঁকে জিজ্ঞাসা করছে, তুমি তো ভগবানের কাছ থেকে আসছো— তিনি কি করছেন দেখে এলে? নারদ বলছেন, তাঁকে দেখে এলাম, তিনি সূঁচের ভিতর দিয়ে একটা হাতি ঢোকাচ্ছেন আর বার করছেন। এই শুনে একজন বলল, দূর এ কি কখনো হতে পারে— অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু আর একজন, সে ভক্ত, সে বলল, তুমি যা দেখেছ ঠিক

দেখেছ। তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব। তাঁর রাজ্যে অসম্ভব বলে কিছু নেই।'

মথুরবাবু একবার বলেছিলেন, ঈশ্বর কি আর যা খুশি তাই করতে পারেন? তাঁকেও তাঁর আইন মেনে চলতে হয়। ঠাকুর বলছেন, যাঁর আইন, তিনি সে আইন ভাঙতে পারেন। মথুরবাবু বলছেন, তা হতে পারে না। লাল ফুলের গাছে কখনও সাদা ফুল ফুটতে পারে? তারপর দিন দেখা গেল, একটা লাল জবাফুলের গাছে একটা সাদা ফুল ফুটেছে। এই কুদরত রঙ্গবিরঙ্গী— ভগবানের লীলা।

এই লীলাময় ভগবানই অবতীর্ণ হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে। কাশীপুর বাগানবাড়িতে তখন বেলা সাতটা-আটটা হবে। নরেন্দ্র, রাখাল কালী, মাস্টার প্রভৃতির সঙ্গে আস্তে আস্তে, কখনও-বা ইশারা করে কথা বলছেন। ঠাকুরের পূর্বরাত্রির দেহের অবস্থা স্মরণ করে ভক্তেরা বিষাদ গম্ভীর হয়ে চুপ করে বসে আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রাদিকে বলছেন, 'এর ভিতর দুটি আছেন। একটি তিনি। আর একটি ভক্ত হয়ে আছে। তারই হাত ভেঙেছিল— তারই এই অসুখ করেছে। বুঝেছ?'

ভক্তেরা অপেক্ষা করছেন আবার কী বলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ— 'কারেই-বা বলব, কেই-বা বুঝবে?' কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর আবার কথা কইছেন। 'তিনি মানুষ হয়ে— অবতার হয়ে ভক্তদের সঙ্গে আসেন। ভক্তেরা তাঁরই সঙ্গে আবার চলে যায়।'

রাখাল— 'তাই আমাদের আপনি যেন ফেলে না যান।' ঠাকুর মৃদু মৃদু হাসছেন। বলছেন : 'বাউলের দল হঠাৎ এল— নাচলে, গান গাইলে; আবার হঠাৎ চলে গেল। এল—গেল, কেউ চিনলে না।' (ঠাকুরের ও সকলের ঈষৎ হাস্য)। কিয়ৎক্ষণ পর ঠাকুর আবার বলছেন—

'দেহধারণ করলে কষ্ট আছেই। এক-একবার বলি আর যেন আসতে না হয়। তবে কি— একটা কথা আছে। নিমন্ত্রণ খেয়ে খেয়ে আর বাড়ির কড়াই-এর ডাল-ভাত ভালো লাগে না। আর যে দেহধারণ করা— এটি ভক্তের জন্য। ভগবানই তো ভক্ত হয়েছেন। ভক্তদের সঙ্গে আনন্দ করবেন বলে।' নিজের ভক্তিসাধনা দেখিয়ে ভক্তদের বোঝাতে চাইছেন— ভক্তির পথ। আর কিছু চাই না। শুধু একটা বাসনা— ভক্তসঙ্গ করব। মা'র কাছে প্রার্থনা করেছিলেন— 'রসে-বশে রাখিস আমাকে। শুকনো সাধু করিসনি। আনন্দরূপে ভক্তসঙ্গ করব।' শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দময় পুরুষ— আনন্দঘন তিনি। ভক্ত হয়ে জগদম্বার সঙ্গে আনন্দ করছেন, আবার ভক্তদের সঙ্গে আনন্দের হাট বসাচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, এর মধ্যে দুটি আছেন— ভক্ত আর ভগবান। একটা সামাজিক বিশৃঙ্খলার সময়, যখন মানুষ তার শাশ্বত যেসব মূল্যবোধ সেগুলো হারিয়ে ফেলে। স্ব-স্বরূপ সম্বন্ধে আত্মবিস্মৃতি মানুষকে গ্রাস করে। মানুষ তার দৈবসত্তাকে হারিয়ে ফেলে। তখন ভগবান স্বয়ং আবির্ভূত হন মানুষ হয়ে, মানুষকে পথ দেখাতে। আমাদের মতো তিনি চলেন ফেরেন, আমাদের মতো শোক-তাপ, ব্যাধি-যন্ত্রণা সহ্য করেন। আপাতদৃষ্টিতে সবকিছু তাঁদের সাধারণ মানুষের মতো। কিন্তু তবুও সবকিছুর মধ্যেও থাকে অসাধারণত্বের ছাপ। স্বামী বিবেকানন্দ অবতারদের জীবন-কর্মকে বলছেন অলৌকিক। দেখে মনে হয় তাঁদের সবকিছুই লৌকিক। আবার তার মধ্যেও অনেক কিছুই থাকে যা মনে হবে অলৌকিক।

বিষ্ণুপুরাণে ভগবানের ছয়টি গুণের কথা আছে—

'ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা।।'

প্রথমে ঐশ্বর্য— ঠাকুর বলছেন— 'ঈশ্বর ও তাঁর ঐশ্বর্য। এই জগৎ তাঁর ঐশ্বর্য। কিন্তু ঐশ্বর্য দেখেই লোকে ভুলে যায়, যাঁর ঐশ্বর্য তাঁকে খোঁজে না।' ঐশ্বর্যের মায়ামোহ থেকে মুক্তির জন্য ঠাকুর বলছেন— 'ঈশ্বরলাভ করলে তাঁর বাহিরের ঐশ্বর্য, তাঁর জগতের ঐশ্বর্য ভুল হয়ে যায়, তাঁকে দেখলে তাঁর ঐশ্বর্য মনে থাকে না।' শ্রীরামকৃষ্ণ ঐশ্বর্যহীন। গিরিশচন্দ্র বলতেন— 'রামচন্দ্র তির-ধনুক দিয়ে জগৎ জয় করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ জগৎ জয় করেছিলেন বাঁশি বাজিয়ে, আর শ্রীরামকৃষ্ণ জগৎ জয় করবেন প্রণাম করে।' কেন একথা বলছেন গিরিশচন্দ্র? কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ সব ঐশ্বর্য গোপন করে এসেছেন। তাঁর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অহংকার শূন্যতা। গুরু, কর্তা, অবতার এসব কথা শুনলে বিরক্ত হতেন। বলছেন, আমি কিছু জানি না, সব মা জানেন। নতুন কেউ এলে বারবার মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে নমস্কার করেন। তাঁর ঐশ্বর্য বিনয় ও ঈশ্বরময়। তাঁর জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা ঈশ্বরকেন্দ্রিক।

দ্বিতীয় বীর্য— বীরত্ব, শৌর্য, তেজ, পরাক্রম। এই বীর্য শারীরিক ও আধ্যাত্মিক। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের খাজাঞ্চি আমার মাইনে নিয়ে সই করতে বলেছিল। আমি বললাম— তা আমি পারব না। আমি এক ঈশ্বরের দাস। আর কার দাস হব?' কাউকে তোষামোদ করছেন না। বলছেন, ভক্তি হবে ডাকাত পড়া।

তৃতীয় যশ— ভারতবর্ষে, বহির্বিশ্বে আজ শ্রীরামকৃষ্ণের নাম সর্বজনবিদিত। তাঁর আবির্ভাবে সূচিত হলো আধুনিক ভারত, সত্যযুগ। স্বামীজী বলছেন, '...হিন্দুধর্ম নামক যুগযুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশ-কাল-যোগে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ধর্মখণ্ড সমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায়— এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক, সার্বকালিক, সার্বদৈশিক স্বরূপ স্বীয়জীবনে নিহিত করিয়া, লোকসমক্ষে সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন করিতে লোকহিতের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন' (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪)। সনাতন হিন্দুধর্মই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও কর্মের ভাবোপলব্ধির সঙ্গে মিলিত হয়ে নব যুগ ধর্মের রূপ পরিগ্রহ করেছে। এমন একজনের আসার প্রয়োজন হয়েছিল, যিনি সকলের ভেতর ঈশ্বরকে দেখবেন, যাঁর হৃদয় কেঁদে উঠবে দরিদ্রের জন্য, দুর্বল অবজ্ঞাতের জন্য, পদদলিতের জন্য এবং ভারতের ও ভারতের বাইরের প্রত্যেকটি মানুষের জন্য; আর সেই সঙ্গে যাঁর উজ্জ্বল মেধা এমন সব ভাবধারণ করবে, যা শুধু ভারতের নয়, ভারতের বাইরেও সব বিরোধী ধর্মসম্প্রদায়ের সামঞ্জস্যবিধান করবে এবং একটা অপূর্ব সমন্বয় ঘটাবে— হৃদয় ও মস্তিষ্কের, সর্বজনীন ধর্ম গড়ে তুলবে। এরূপে একজনের আসার খুবই প্রয়োজন হয়েছিল, আর শ্রীরামকৃষ্ণের ভেতর এরূপ একজনই আবির্ভূত হয়েছিলেন' (শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ'— স্বামী নির্বেদানন্দ)। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সমাহিত একটি ছবি দেখিয়ে একবার বলেছিলেন, 'কালে এই ছবি ঘরে ঘরে পূজা হবে। মাইরি বলছি দিব্যি করে বলছি।' আজ তাই হচ্ছে।

চতুর্থ শ্রী— ভগবানের শ্রী, লাবণ্য অপরিমেয়, অবর্ণনীয়। শ্রীরামকৃষ্ণের রূপ-লাবণ্য প্রসঙ্গে শ্রীমা সারদা বলছেন, 'তাঁর গায়ের রং হরিতালের মতো ছিল— সোনার ইষ্ট কবচের সঙ্গে গায়ের রং

মিশে যেত। যখন তেল মাখিয়ে দিতুম, দেখতুম সব গা থেকে জ্যোতি বেরুচ্ছে। যখনই কালীবাড়িতে বার হতেন, সব লোক দাঁড়িয়ে দেখত, বলতো, 'ওই উনি যাচ্ছেন।' কামারপুকুরে যখন যেতেন ঘরের বার হলেই, মেয়ে-মদ্দ হাঁ করে থাকত (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, অখণ্ড)'। 'মিরর' সংবাদপত্রে (২৮.৩.১৮৭৫) কেশবচন্দ্র সেন লিখছেন, 'দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস রামকৃষ্ণকে বেলঘরের বাগানে দর্শন করিয়াছি। তাঁহার গভীরতা, অন্তর্দৃষ্টি, বালকস্বভাব দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি শান্তস্বভাব, কোমল প্রকৃতি, আর দেখিলে বোধ হয়, সর্বদা যোগেতে আছেন।'

পঞ্চম জ্ঞান— ভগবান জ্ঞানস্বরূপ। জগতের সকল জ্ঞানের আকর তিনি। জ্ঞান বলতে বোঝায় সর্বজ্ঞানের আকর যিনি--- ঈশ্বরজ্ঞান। ঠাকুর তো পরাজ্ঞানের পরমোৎকর্ষ। তিনি যে আদেশ পেয়েছেন, তাঁর জ্ঞানের শেষ নেই। ঠাকুর বলছেন— 'যে জ্ঞান ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে— তা ফুরায় না।' শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন— 'মানুষের এক ছটাক বুদ্ধিতে ঈশ্বরের স্বরূপ কি বুঝা যায়? এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে? তিনি যদি কৃপা করে কখনো দর্শন দেন আর বুঝিয়ে দেন তবে বুঝা যায়; নচেৎ নয়।' এর পরই ঠাকুর বলছেন, 'পূর্ণজ্ঞানের পর অভেদ। যেমন মণির জ্যোতি আর মণি অভেদ। মণির জ্যোতি ভাবলেই মণি ভাবতে হয়। ...কিন্তু এ অভেদজ্ঞান— পূর্ণজ্ঞান না হলে হয় না। পূর্ণজ্ঞানে সমাধি হয়। ...সমাধিতে কী হয় মুখে বলা যায় না। নেমে একটু অভ্যাসের মতো বলা যায়। যখন সমাধি ভঙ্গের পর ওঁ ওঁ বলি তখন আমি একশো হাত নেমে এসেছি। ব্রহ্ম বেদবিধির পার, মুখে বলা যায় না। সেখানে 'আমি' 'তুমি' নেই।'

ষষ্ঠ বৈরাগ্য— বৈরাগ্য অর্থ সংসার বা বিষয় ভোগে অনাসক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন বৈরাগ্য ও ত্যাগের ঘনীভূতরূপ। শ্রীমা সারদা বলছেন, 'তাঁর ষোলোআনা ত্যাগ; ত্যাগই তাঁর ভূষণ। এক মাড়োয়ারি ভক্ত বলেছিল, সংসার করলে না, ছেলেপুলে না হলে শেষ গতি কে করবে, দেহের শেষ কাজ। ঠাকুর উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন— কি এই দেহের জন্য সন্তান উৎপাদন? ছি ছি করে থুতু ফেলতে ফেলতে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বলছেন— 'দেহ পচলে, আপনি টেনে ফেলে দেবে। শালা বলে কি না দেহের জন্য সংসার। পুড়ে দেড় সের ছাই বই তো নয়।' শ্রীমা সারদা বলছেন, 'আহা, কী বৈরাগ্য তাঁর ছিল বলো তো, মা? যত বড়ো দেহ হোক না কেন, সেই দেড় সের ছাই। এরই এত দম্ভ— অহংকার।'

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, 'তিনি যখন তাঁর সন্ন্যাসী ছেলেদের বিশেষভাবে উপদেশ দিতেন, তখন অনেক সময় নিজে উঠে চারদিক খুঁজে দেখতেন কোনো গেরস্থ সেখানে আছে কি না। যদি দেখতেন, কেউ নেই বা আসছেন না, তবেই জ্বলন্ত ভাষায় ত্যাগ-তপস্যার মহিমা বর্ণনা করতেন। সেই সংসার-বৈরাগ্যের প্রবল উদ্দীপনাতেই তো আমরা সংসারত্যাগী উদাসীন।' স্বামীজী বলতেন, 'ঠাকুর ত্যাগের বাদশা। শ্রীরামকৃষ্ণ গৃহস্থদের উদ্দেশে বলছেন, 'কিন্তু কী ভোগ সংসারে করবে? কামিনী-কাঞ্চন ভোগ? সে তো ক্ষণিক আনন্দ, এই আছে এই নাই। প্রায় মেঘ ও বর্ষা লেগেই আছে, সূর্য দেখা যায় না। দুঃখের ভাগই বেশি। আর কামিনী-কাঞ্চন- মেঘ সূর্যকে দেখতে দেয় না।' ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ আপন জীবনাচরণে, উপদেশে দেখাচ্ছেন, 'বৈরাগ্যই তাঁকে লাভ করার উপায়।'

ষড়ৈশ্বর্য সম্পন্ন ভগবান অবতীর্ণ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে। রোমাঁ রোলাঁ লিখছেন, 'একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণই ঈশ্বরের সমস্ত ঐশ্বর্যকে আত্মসাৎ করে জগতের সামনে নিজেকে উপস্থিত করেছিলেন। সকল নির্ঝর সকল নদীর যেখানে মিলন ঘটেছে, সেই বিধাতাসদৃশ মহানদীর মহাসঙ্গমকে রামকৃষ্ণ যে কেবল নিজের মধ্যে অন্যদের চেয়ে পূর্ণতররূপে ধারণা করেছিলেন তাই নয়, তিনি তাঁকে উপলব্ধিও করেছিলেন।' এই পূর্ণ ব্রহ্মকে ত্যাগী সন্তান স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বলছেন, 'ঠাকুর বড়ো দুষ্টু। সহজে ধরা দেন না।' এই যে সন্তান স্নেহমাখা সুরে ভগবানকে বলছেন দুষ্টু— এটাই ভক্ত আর ভগবানের আটপৌরে সম্পর্ক। আটপৌরে কাপড়ের কথা আমরা শুনেছি। সেই কাপড় যা অষ্টপ্রহর বা চব্বিশ ঘণ্টা পরা যায়। ভগবানের সঙ্গে এইরকম আটপৌরে সম্পর্ক পাতাতে হবে— অর্থাৎ মনে করতে হবে, সবসময় তিনি আছেন আমার সঙ্গে। আবারও মহারাজ বলছেন, 'ঠাকুর সহজে ধরা দেন না।' এটি ভগবানের খামখেয়াল। সাধন-ভজন-তপস্যা করে তাঁকে ধরা যায় না। কৃপা করে যদি তিনি ধরা দেন তবেই তাঁকে লাভ করা যায়।

'ওরে কুশীলব করিস কি গৌরব।
ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে।।'

উপনিষদে বলছে— 'যমেবৈষ বৃণুতে কেন লভ্যঃ' অর্থাৎ ইনি যাকে বরণ করেন, কৃপা করেন, তিনিই তাঁকে লাভ করেন। স্পিনোডারের কথায়— 'He who loves God, cannot endeavour that God should love him in return.' অথবা এর বিপরীত।

ঠাকুর আপন দেহাবয়ব দেখিয়ে বলছেন, 'এর মধ্যে দুটি আছে, ভগবান আর ভক্ত। ভগবান তো পূর্ণ, তাঁর তো কোনো অপূর্ণতা নেই, অভাব নেই; তিনি তো অনবদ্য, পরাকাষ্ঠা Perfect Being।' উপনিষদ

ফঃ ৪

যখন তাঁকে সত্য বলেন, তখন পূর্ণ ও পরোৎকৃষ্ট সত্তা অর্থেই বলেন, নইলে একটি তৃণখণ্ডও তো আপন অকিঞ্চিৎকরতা নিয়ে সত্য। তাই প্রশ্ন জাগে— শাস্ত্রমতে এবং প্রচলিত বিশ্বাসানুযায়ী তিনি সর্বদিক দিয়ে পরিপূর্ণ। তিনি আবার ভক্ত কেন? আর একটি ভিন্ন সত্তা কেন? শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'তিনি নিজের মাধুর্য আস্বাদন করবার জন্য দুটি হয়েছেন, তাই রাধাকৃষ্ণলীলা।' তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলছেন তিনি 'রসো বৈ সঃ'— ব্রহ্ম রসস্বরূপ; কারণ তিনি রস অনুভবে আনন্দ পান। এই আনন্দ হলো শিল্পী বা শিল্প-রসিকের আনন্দ। তিনি বিশ্বরচনা করে আনন্দ পান। ব্রহ্ম এখানে একাধারে শিল্পী, শিল্পকর্ম ও শিল্পরসিক। সেই কারণে বিশ্বসত্তা রসস্বরূপ।

রস উপলব্ধি করতে চাই দুটি ভিন্ন প্রকৃতির সত্তা। কারণ বিশুদ্ধ একত্বের মধ্যে রস উপলব্ধির অবকাশ নেই। তার জন্য প্রয়োজন দ্বৈত বোধের; চাই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের জগৎ, চাই তার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য মন। দুয়ের জানাজানি, দুয়ের পরিচয়, দুয়ের প্রীতি, এমনকী দুয়ের বিরোধ— এদের অবলম্বন করেই তো রসের ধারা প্রবাহিত হয়। সুখ আছে, দুঃখ আছে, মিলন আছে, বিরহ আছে, প্রীতি আছে কিন্তু তাদের সবাইকে জড়িয়ে নিয়ে আছে রস।

উপনিষদ বলছেন, এই রসের আকর্ষণেই ব্রহ্ম আদিম একক অবস্থা ত্যাগ করে বহু ও বিচিত্ররূপ বিশ্বে পরিবর্তিত হলেন। যিনি ছিলেন অরূপ, তিনি হলেন বিশ্বরূপ। একাকী থেকে আনন্দ পেলেন না বলেই তিনি দ্বিতীয়কে চাইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'এর মধ্যে দুটি আছে— একটি ভক্ত আর অপরটি ভগবান।' এই ভক্ত আর ভগবানের লীলামাধুর্য প্রকাশ করার জন্য অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই দুই ভাবের মধ্যে একটি পূর্ণ, অপরটি অপূর্ণ। দুই-ই বিপরীত ভাব। এই দুই ভাবেতেই তিনি অবস্থান করেন। মা জগদম্বার সঙ্গে লীলাখেলায় তিনি ভক্ত, আর ভক্তদের কাছে তিনি কৃপাসিন্ধু ভগবান। শুধু ভক্তভাবে থাকা নয়, ইচ্ছা করলেই তিনি ভগবত-ভাব থেকে ভক্ত-ভাবে যেতে পারেন, আবার ভক্ত-ভাব থেকে ভগবত-ভাবে উত্তীর্ণ হতে পারেন। কত ভাবে ভক্ত ভগবানের সঙ্গে খেলা করেছেন, তার কোনো যেন শেষ নেই। ঠাকুরের জীবনে দেখছি কী অপূর্ব লীলা মায়ে-ছেলের। পূজা করছেন— তাতে আর নিয়ম নেই, বিধি নেই, মন্ত্র নেই। মায়ের সঙ্গে কথা বলছেন, মায়ের চিবুক ধরে আদর করছেন। মা-কে খাইয়ে দিচ্ছেন, আবার নিজেও খাচ্ছেন। খেতে খেতে এঁটো হাতে মায়ের মুখে খাবার গুঁজে দিলেন। আর মা'র মুখে তখন যে তৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে, তা অতুলনীয় এক স্বর্গীয় শোভা। ঠাকুর তাই করছেন— মায়ে ছেলেতে খেলা চলছে। আবার মা-র অদর্শনে ছেলে কাতর। নিজেই বলছেন— বুকের ভিতরটা যেন গামছা নিংড়ানোর মতো কে নিংড়াচ্ছে।' এত কষ্টবোধ করছেন মাকে দেখতে পাচ্ছেন না বলে। চিৎকার করে কাঁদছেন, মাটিতে মুখ ঘষছেন। ভগবানের আকর্ষণ এমনই দুর্বার। মীরাবাঈ রাজৈশ্বর্য, সমাজ, সংসার সব ত্যাগ করে পথে বেরিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য। ঈশ্বর ছাড়া আর কোনো চিন্তা নেই— এমনকী 'আমি' যে আছে সে বোধই থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন— হাত-পা ছেড়ে তালগাছ থেকে লাফিয়ে পড়া। ভগবানকে পাব কী না পাব জানি না। আবার ঠাকুরকে দেখছি, মা-কে বলছেন, 'দেখা দিবি না? এই আমি গলায় খাঁড়া বসালাম।' এই পরিস্থিতিতে অগত্যা মা বাধ্য হয়ে দেখা দিলেন। সেইজন্য শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন, 'আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যটা শ্রীরামকৃষ্ণ যেন জোর করে দখল করে নিয়েছিলেন— by violence।' ঠাকুর দেখালেন ভক্তের ব্যাকুলতা আর আমাদের শেখালেন তীব্র ব্যাকুলতায় আমরা আমাদের হারানো ভগবানকে খুঁজে পেতে পারি।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'প্রেম-ভক্তি শিখাবার জন্যই ভগবান মানুষদেহ ধারণ করে সময়ে অবতীর্ণ হন।' সত্যই তো। এই প্রেম-ভক্তি শিখাবার জন্যই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সমস্ত ঐশ্বর্য গোপন করে ছদ্মবেশে রাজার মতো। প্রকট লীলার শেষ লগ্নে যখন তিনি অসুস্থ, তাঁর সঙ্গে ছদ্মবেশে দেখা করতে এসেছিলেন বিনোদিনী। ঠাকুর তাকে সাদরে গ্রহণ করছেন। কত কথা বলছেন তার সঙ্গে, কতরকম উপদেশ দিচ্ছেন, কতভাবে আশীর্বাদ করছেন তাকে। পতিত, দুর্বল, অক্ষম, অসহায়—এদের উদ্ধার করার জন্যই তো তিনি। গলায় ক্যানসার, কথা বলতে কষ্ট হয়, তাও তিনি কথা বলে যাচ্ছেন। ধর্ম প্রসঙ্গ করছেন। স্বামীজীর কথা থেকে জানা যায়, জীবনের অন্তিম লগ্নে, শিষ্যদের নিষেধ সত্ত্বেও ঠাকুর কথা বলছেন, উপদেশ দিচ্ছেন দূর থেকে আগত এক ভক্তকে। এই কথা বলার ফলেই তিনি আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। দুঃখ করে বলছেন, 'শ্রীচৈতন্য পায়ে হেঁটে নাম বিলোতেন আর আমার এমন শরীর, গাড়ি ছাড়া চলতে পারি না।' ঠাকুর কী বিলোচ্ছেন? ধন-দৌলত নয়, দেখাচ্ছেন মানবজীবনের সার্থকতার পথ— যো সো করে ঈশ্বরকে পাওয়া। ভগবত পথে চলে সংসার নির্বাহ কর। ভগবানে ভালোবাসা আর অপার করুণার কথা শোনাচ্ছেন, বিলোচ্ছেন অকাতরে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। মানুষের যাতে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হয়, সেই পথ বলে দিচ্ছেন। শ্রীমা বলছেন, 'এই জন্যই তো ঠাকুর এসেছিলেন? ঠাকুর কি শুধু রসগোল্লা খেতে এসেছিলেন।' স্বামীজী বলছেন, 'চির-উন্মাদ-প্রেম-পাথার।' প্রকৃত অর্থে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এক প্রেমের উচ্ছল-প্রবাহ— চারদিক প্লাবিত করে ধেয়ে চলেছে— কাউকে বাদ দেবেন না, কোনো ভেদাভেদ নেই, মতুয়ার বুদ্ধি নেই, সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছেন, অমৃতসাগরে মেলবার জন্য। প্রেম-সিন্ধু ভগবান এক জায়গায় বলছেন, 'এই খোলটার মধ্যে সেই মা ছাড়া আর কিছু নেই।' মা অর্থাৎ জগন্মাতা, যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চালিকা শক্তি। স্বামীজীর কথায় ভক্ত আর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতই।

'যস্য বীর্যেণ কৃতিনো বয়ং চ ভুবনানি চ।
রামকৃষ্ণং সদা বন্দে শর্বং স্বতন্ত্রমীশ্বরম্।।'

—যাঁর শক্তিতে আমাদের সমস্ত কৃতিত্ব, বিশ্বচরাচরের সমস্ত সৃষ্টি যাঁর থেকে, তিনিই হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সেই শ্রীরামকৃষ্ণকে সর্বদা প্রণাম করি। কারণ তিনি মঙ্গলস্বরূপ। তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর— স্বয়ং ঈশ্বর।

'দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ।।'

(শ্রীমদ্‌ভগবদগীতা, ১১।১২)

—যদি আকাশে সহস্র সূর্যের প্রভা একসঙ্গে প্রকাশিত হয়, তবে তা সেই মহাত্মার তেজঃপ্রভাব সদৃশ হতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।।

(লেখক সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ)

স্বামী অভেদানন্দের লেখনীতে পরমহংসদেবের কল্পতরু ও মহাপ্রয়াণের কথা

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দের গভীর দুঃখ ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবৈচিত্র্যের নানান গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি সত্ত্বেও অনুল্লেখযোগ্য সাধারণ দর্শক বা ইত্যাদির স্থানে তিনি রয়ে গেছিলেন। জীবনকথাতে অভেদানন্দের সেই অভিমান স্পষ্ট— '১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ হইতে যে সকল ঘটনা শ্রীম-লিখিত 'কথামৃত' গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু আমি অল্পবয়স্ক ছিলাম বলিয়া বোধহয় কথামৃতের সকল জায়গায় আমার নাম উল্লেখ করা হয় নাই, ফলে আমি ইত্যাদির মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি।'

প্রসঙ্গত, স্বামী অভেদানন্দের জন্ম ২ অক্টোবর, ১৮৬৬। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তাঁর যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৮। এদিকে ১৮৮১ সালের নভেম্বরে নরেন্দ্রনাথ সিমুলিয়ায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম দর্শন পান। ১৮৮২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম/মাস্টারমশায়) দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রথম দর্শন করেন। আর ১৮৮৪ সালে স্বামী অভেদানন্দ (পূর্বনাম কালীপ্রসাদ চন্দ্র, তাই 'কালী মহারাজ' বলেও পরিচিত) শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শন লাভ করেন।

স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি অতি বিশেষ মুহূর্তে উপস্থিতির কথা জানা যায় : ১. ১৮৮৪ সালের ৩০ জুন যেদিন সুরেশচন্দ্র মিত্রের উদ্যোগে কলকাতার রাধাবাজারে বেঙ্গল ফোটোগ্রাফ কোম্পানির স্টুডিয়োতে শ্রীরামকৃষ্ণের ফোটো তোলা হয়, সেদিন তিনি উপস্থিত ছিলেন।

২. ১৮৮৪ সালের ৩ জুলাই রথের দিন বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে আনন্দে নৃত্য করেছিলেন।

৩. ১৮৮৪ সালের ১৫ জুলাই সুরেশচন্দ্র মিত্রের বাগান বাড়ির মহোৎসবে তিনি উপস্থিত ছিলেন।

৪. দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বকলমা' নেবার দিন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

৫. শশধর তর্কচূড়ামণি যেদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন, সেদিনও অভেদানন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৬. কলকাতার হাটখোলায় বারোয়ারিতলায় যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ নীলকণ্ঠের কৃষ্ণযাত্রা শুনতে গিয়েছিলেন সেদিন উপস্থিত ছিলেন তিনি।

৭. ১৮৮৫ সালের ২৪ এপ্রিল গলরোগের চিকিৎসার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতার দুর্গাচরণ ডাক্তারের কাছে দেখাতে গেলে সঙ্গে যান অভেদানন্দ।

৮. ১৮৮৫ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে পানিহাটির চিড়া মহোৎসবে যোগদানের যাত্রায় শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর উপস্থিতি জানা যায়।

৯. ১৮৮৫ সালের ৩১ অক্টোবর শ্যামপুকুরের বাড়িতে কোয়েকার সম্প্রদায়ের এক খ্রিস্টান পরমহংসদেবকে দেখতে এলে সেদিনও তিনি উপস্থিত ছিলেন।

১০. ১৮৮৫ সালের ১১ ডিসেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে শ্যামপুকুর থেকে কাশীপুর বাগানবাটিতে আনা হলে উপস্থিত ছিলেন অভেদানন্দ।

১১. ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি কল্পতরু হয়েছিলেন ঠাকুর। সেদিনও ছিল অভেদানন্দের উপস্থিতি।

১২. ১৮৮৬ সালের ১৬ আগস্ট শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধির দিন অভেদানন্দ সেখানে ছিলেন।

১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি। কলকাতার কাশীপুর উদ্যানবাটি। যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও ভক্তমণ্ডলীর কাছে অভাবনীয়ভাবে আত্মপ্রকাশ করলেন। দিনটি 'কল্পতরু দিবস' নামে খ্যাত। সেদিন বাঙ্গালি তথা বিশ্ববাসীকে চৈতন্য জাগরণের আশীর্বাদ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এই কল্পতরু লীলা-কাহিনি নানান গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। যেমন স্বামী সারদানন্দ রচিত 'লীলাপ্রসঙ্গ'-এ, কবি অক্ষয়কুমার সেন বিরচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি'-তে শ্রীম কথিত

‘শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত’-এ। এছাড়াও ঠাকুরের পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দ রচিত ‘আমার জীবনকথা’ গ্রন্থে ঘটনাটি বিবৃত আছে। প্রস্তুত প্রবন্ধে স্বামী অভেদানন্দের লেখা থেকে তথ্য উপস্থাপন করা হলো।

‘‘শ্রীরামকৃষ্ণ তখন গলায় দুরারোগ্য কর্কট রোগে আক্রান্ত। সেদিন অফিস ছুটির দিন। বিকেলে বাগানবাটিতে এসেছেন গিরিশ ঘোষ-সহ গৃহী ভক্তরা। সেবক-পার্ষদরাও রয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এদিন কিছুটা সুস্থ অনুভব করে দোতালা থেকে নীচে নেমে বাগানে হাঁটছেন। এরই মধ্যে গিরিশ ঘোষের সঙ্গে কথা হলো। ঐশী সংলাপে ঠাকুর বাহ্যজ্ঞানশূন্য হলেন। ভাবাবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। সংজ্ঞালাভ করে সবাইকে আশীর্বাণী দিলেন, ‘তোমাদের চৈতন্য হোক’। সকলকে স্পর্শ করলেন, তাদের অধ্যাত্ম-আঁখি খুলে দিলেন, সকলের সকল প্রার্থনা পূরণ করলেন। ‘ভাই ভূপতি সমাধি প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহাকে শ্রীশ্রীঠাকুর কৃপা করিয়া বলিয়াছিলেন, ‘তোর সমাধি হবে’। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত গরিব অবস্থায় অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছিলেন বলিয়া অর্থ প্রার্থনা করিয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে কৃপা করিয়া বলিলেন, ‘তোর অর্থ হবে।’ রামলালদাদা, বৈকুণ্ঠ সান্যাল প্রভৃতি গৃহস্থ-ভক্তদিগকে তাহাদের যাহা যাহা প্রার্থনা ছিল, তাহা তিনি আশ্বাস দিয়া ‘পূর্ণ হবে’ বলিয়া কৃপা করিলেন।’’

কাশীপুর শ্মশানে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধি মন্দির নির্মিত হয়েছে এই সংবাদ পেয়ে আনন্দিত হয়ে দার্জিলিঙের রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম থেকে ১৯৩৪ সালের ১২ আগস্ট স্বামী অভেদানন্দ জামশেদপুর নিবাসী তাঁর মন্ত্রশিষ্য শ্রীবীরেন্দ্রনাথ হাজরাকে একটি চিঠি লেখেন। সেখানে তাঁর পরমারাধ্য গুরুদেবের মহাপ্রয়াণের কথা রয়েছে। প্রসঙ্গত, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগ হয় কাশীপুর বাগানে ১২৯৩ বঙ্গাব্দের ৩১ শ্রাবণ বা ১৮৮৬ সালের ১৬ আগস্ট রাত্রি ১টার সময়। সেদিন ছিল রবিবার, পূর্ণিমা তিথি।

‘‘তখন আমরা সন্ন্যাসী সেবকগণ তাঁহার নিকটে বসিয়াছিলাম। হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থির হইয়াছিল এবং তিনি গভীর সমাধিতে মগ্ন হইলেন। নরেন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে ওঙ্কারধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং আমরা তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়া সমবেত স্বরে ওঁ উচ্চারণ করিতে লাগিলাম। সকলের মনে আশা ছিল যে অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইবে। এইরূপ আশা করিয়া আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া বসিয়া রহিলাম। রাত্রি শেষ হইয়া গেল, তথাপি শ্রীশ্রীঠাকুরের চৈতন্য ফিরিয়া আসিল না। পরদিন সোমবার ১৭ আগস্ট প্রায় বেলা ন’টার সময় শ্রীমাকে সংবাদ দেওয়া হইল। শ্রীমা উপরে আসিয়া শয্যার পার্শে বসিয়া ‘মা, কোথায় গেলে গো’ এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমরা এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্বামী ও স্ত্রীর অপূর্ব সম্বন্ধ ভাবিতে ভাবিতে নির্বাক হইয়া রহিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যাঁহাকে যোড়শীরূপে পূজা করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে জগন্মাতা জানিতেন।’’

স্বামী অভেদানন্দের ওই চিঠি থেকে আরও জানা যায়, একজন নেপালি ক্যাপ্টেন ভক্ত সংবাদ পেয়ে এলেন। চৈতন্য ফিরিয়ে আনবার জন্য তিনি ঠাকুরের মেরুদণ্ডে ঘি মালিশ করানোর পরামর্শ দিলেন। শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) তখন ঠাকুরের শরীরে ঘি মালিশ করতে বসলেন। কিন্তু কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারকে বেলা ১টার সময় আনা হলো। তিনি ঠাকুরের দেহ পরীক্ষা করলেন এবং বললেন, এবার মহাসমাধি ঘটেছে, জীবনীশক্তি আর নেই, দেহেরও পচন শুরু হয়েছে। দেহের সৎকার এখনই করা উচিত। তখন সকলের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। সবাই গভীর শোকে মগ্ন হলেন।

ঠাকুরের দেহ হলুদ বস্ত্র দিয়ে সাজানো হলো। গলায় দেওয়া হলো ফুলের মালা। পাদপদ্মে দেওয়া হলো সচন্দন পুষ্প। একটি খাটে শয়ান করানো হলো দিব্যদেহ। উপস্থিত সবাই খাটের পাশে এসে দাঁড়ালেন। দুটি গ্রুপফোটো তোলা হলো।

বেলা পাঁচটার সময় কাশীপুর বাগান থেকে সংকীর্তন করতে করতে শ্মশান ঘাটে সবাই চললেন। সঙ্গে নেওয়া হলো নিশান খোল, করতাল, ওঁকার, ত্রিশূল, বৈষ্ণব-খুন্তি, ক্রস-ক্রেসেন্ট, সব ধর্মের সিম্বল একত্র করে সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রতীক নিয়ে সেই শোভাযাত্রা চললো। সন্ন্যাসী শিষ্যরা চিতায় অগ্নিপ্রদান করলেন। একটি তামার কলসীতে অস্থিভস্ম সংগ্রহ করে তা মাথায় নিয়ে কাশীপুর বাগানবাড়িতে ফিরে আসা হলো।

একটি তামার কৌটোর মধ্যে সেই অস্থিভস্মের অধিকাংশটা রাখা হয়। সেই কৌটো ও অস্থিই বেলুড়ে নিত্যপূজা হয়। বাকি অস্থিভস্ম তামার কলসীতে করে মাথায় নিয়ে পরবর্তী জন্মাষ্টমীর দিন (১২৯৩ বঙ্গাব্দের ৮ ভাদ্র/১৮৮৬ সালের ২৪ আগস্ট) গৃহীভক্ত রামচন্দ্র দত্তের শিমলার বাড়ি থেকে সংকীর্তন সহযোগে কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে নিয়ে যান সন্ন্যাসী ও গৃহীভক্তেরা। সেখানে মহাসমারোহে ওই কলসী ও অস্থির সমাধি দেওয়া হয়েছিল।

স্বামী অভেদানন্দের শিষ্য রঞ্জিতকুমার রায়কে লিখিত একটি পত্র (১৯২৮ সালের ১১ মে) থেকে জানা যায়, কাশীপুরের বাগানে যখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেহরক্ষা করলেন তখন তাঁর অভাবে সবাই অত্যন্ত শোকাকুল হয়ে পড়েছিলেন, ‘‘স্বামীজী এত বেশি কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তিনি গঙ্গায় আত্মহত্যা করিতে গিয়েছিলেন। ঠাকুরের বিয়োগে শ্রীমা কয়েকদিন ‘মা কোথায় গেলে, মা কোথায় গেলে’ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেন। আমরা সকলে তাঁহাকে কত সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতাম। পরে ঠাকুর একদিন শ্রীমাকে দর্শন দিলেন ও বলিলেন— ওগো তুমি কাঁদছো কেন, এইতো আমি তোমার কাছে— কেবল এ ঘর আর ও ঘর।’’ ■

ধর্ম জিজ্ঞাসা—পনেরো

গুরুই দেখান পথ, মেশান ঈশ্বরের সঙ্গে

নন্দলাল ভট্টাচার্য

'আমায় টেনে নাও না গুরু/তোমার সেই দেশে/যে দেশে নেই জন্ম-মৃত্যু/প্রাণ ছুটেছে তার আশে।' —এ হলো এক উদাস বাউলের প্রাণের আর্তি। এই আর্তিই আবার সুরে গেয়ে ওঠে, 'গুরুদেব দয়া করো দীনজনে'। সেটাই মন্দ্রিত হয় মন্ত্রে— 'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু, গুরুর্দেবো মহেশ্বর'। আর এসবেরেই সারকথা, গুরু বিনা কৃষ্ণ মেলে না। অর্থাৎ গুরু হলেন ভারতধর্ম সাধন পথের প্রাথমিক সোপান। গুরুতত্ত্ব সনাতন বা হিন্দুধর্মের অন্যতম বিশ্বাস। কেবল ধর্ম সাধনা নয়, জীবনযাপনের ক্ষেত্রেও গুরু হলেন এক অনিবার্য দিগ্‌নির্দেশক।

অবশ্য কেবল হিন্দুধর্ম নয়, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি ধর্মমতেও গুরুর রয়েছে সমান গুরুত্ব। সব মিলিয়ে গুরু এক গুরুতর ব্যাপার। সে ব্যবহারিক ক্ষেত্রেই হোক আর অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রই হোক সর্বত্রই গুরু হলেন প্রকৃত পথপ্রদর্শক।

গুরু মেটান শিষ্যের জ্ঞানতৃষ্ণা। পার্থিব বা অপার্থিব সব বিষয়েই সব জিজ্ঞাসার উত্তর দেন তিনি। মেটান শিষ্যের জানার আকাঙ্ক্ষা। অবশ্য সেক্ষেত্রে গুরুকে যেমন উপযুক্ত হতে হয়, শিষ্যকেও তেমনই হতে হয় যোগ্য। গীতায় স্পষ্ট উল্লেখ— 'প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নের সেবয়া'। অর্থাৎ বিনীত চিত্তে জিজ্ঞাসু হৃদয়ে এবং গুরুকে শুশ্রূষা ও সেবার মাধ্যমেই শিষ্য তাঁর মনের ক্ষুধা মিটিয়ে থাকেন। শুধু তাই নয়, গীতারই মহাবাক্য— শিষ্যকে নিঃসংশয় হতে হবে। সংশয়ের দোলায় দুলতে থাকলে ইহলোক, পরলোক— কোনো ক্ষেত্রেই সফল হওয়া যায় না— বিনাশই অনিবার্য তখন।

এই সংশয় দূর করার কাজটাই করেন গুরু। পথ দেখান তিনি। সেই পথে চলতে চলতেই শিষ্য আপন সাধনায় পরম জ্ঞানের মুখোমুখি হতে পারেন। এক্ষেত্রে গুরু হলেন রথের সারথি। এখনকার মোটরগাড়ির চালক অথবা উড়োজাহাজের পাইলট। তাঁদের ওপর যদি ভরসা না থাকে, বিশ্বাস না থাকে তাহলে আরোহীর পক্ষে কোনো সময়ই তাতে আরোহণের যোগ্যতা থাকে না। আরোহী তখন আরোহণ করতে না পেরে অনেকটা অন্ধের মতোই পথ হাতড়ান অথবা অশেষ কষ্টের মুখে পড়েন। কিন্তু যদি যান চালকের প্রতি বিশ্বাস থাকে, শ্রদ্ধা থাকে, তাহলে অনায়াসেই অনেক দূরের পথও অতিক্রম করতে পারেন যাত্রী— অনায়াসে এবং অনেক দ্রুত।

পার্থিব বা অপার্থিব দুই জীবনেই গুরুর ভূমিকা অনেকটা ওই রকম। তিনি পথ দেখান। সে পথে চলতে হয় শিষ্যকে। গুরু নিজে তাঁকে বহন করে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেন না। সোজা কথায়, কেউ যদি মনে করে, গুরুর আশ্রয় নিলে বা গুরুবরণ করলেই কাঙ্ক্ষিত জায়গায় পৌঁছনো যাবে— তাহলে সেটি হবে চরম ভ্রান্তি। যেমন শিক্ষকমশাই ছাত্রকে অঙ্ক শেখান, অঙ্ক সমাধানের বিভিন্ন সূত্রগুলিও বলে দেন, কিন্তু নিজে ছাত্রের হয়ে পরীক্ষা দেন না। ছাত্রকেই কঠোর অভ্যাসের মাধ্যমে সবকিছু আয়ত্ত করে পরীক্ষা দিতে হয় এবং তখনই আসে সাফল্য। আধ্যাত্মিক জীবনে গুরুর ভূমিকাটাও অনেকটা সেইরকম। তিনি পথ দেখান, যে পথে চলতে হয় শিষ্যকেই— তাহলেই পৌঁছনো যায় লক্ষ্যে।

হিন্দুধর্মে এই কথাটাই বলা হয়েছে বহুবার— বহু ভাবে— নানা রূপকের সাহায্যে। বলা হয়েছে, গুরুই আচার্য। তাঁকে শ্রদ্ধা করতে হয়। শ্রদ্ধাই হলো জ্ঞানের মন্দিরে পৌঁছোবার সিঁড়ি।

শ্রদ্ধাবানরাই জ্ঞানলাভের অধিকারী। অশ্রদ্ধার সঙ্গে কিছু করলে— তা হয় 'এ কেবল দিনে-রাত্রে জল ঢেলে ফুটাপাত্রে/বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবারে'-র মতো। পাত্র আর পূর্ণ হয় না কখনোই। পুরোটাই হয় পণ্ডশ্রম। তার জন্য গুরু কিন্তু দায়ী নন! শ্রদ্ধার সঙ্গে সবকিছু শুনবে। শ্রদ্ধার সঙ্গেই সবকিছু করবে। শ্রদ্ধাই পথ— শ্রদ্ধা ছাড়া নেই কোনো গতি।

এই কথাটিই স্মরণ করিয়ে দিয়ে তৈত্তেরীয় উপনিষদের বাক্য— 'আচার্য দেবো ভব' (১/১১/২)— আচার্যকেই দেবতা জ্ঞানে শুনবে তাঁর কথা— অনুসরণ করবে তাঁকে। তাতেই হবে অভীষ্টলাভ।

এটাই আরও প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ছান্দোগ্য উপনিষদে— 'আচার্যবান পুরুষোবেদ' (৬/১৪/২)— যিনি আচার্যের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করেছেন, তিনিই বেদকে জানেন। জানেন, দেহখাঁচায় বদ্ধ রয়েছে যে অচিনপাখি তাকে মুক্ত করতে না পারলে তা উড়তে পারে না আকাশের ওই নীল আঙিনায়। আর সেটা না হলে হয় না পরমের সঙ্গে মিলন। দেহখাঁচা থেকে মুক্ত হওয়ার ওই সময়টাই মিলনের পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা। ওই বদ্ধ দুয়ারটুকু পার হতে পারলেই জ্বলে ওঠে মিলন বাসরের ঝাড়বাতি। তখনই পরমে লীন হয় খাঁচার ওই অচিন পাখি। পূর্ণ হয় সে অভিসার।

অচিনপাখিকে খাঁচামুক্ত করার এই কৌশলটি বড়ো সহজ নয়। উপযুক্ত গুরুই কেবল দিতে পারেন এর সুলুকসন্ধান। সে কথাই বারবার বলা হয়েছে উপনিষদে, গীতায়। গুরু বিনা গতি নেই। কিন্তু সে গুরুকার্য করার অধিকার তো বংশগত হতে পারে না। তাই-বা কেন, শাস্ত্রপাঠে পাণ্ডিত্য অর্জন করলেও গুরু হবার অধিকার জন্মায় না।

গীতার স্পষ্ট নির্দেশ, গুরু হবেন তত্ত্বদর্শী। যাঁর আত্মদর্শন হয়নি, তিনি কেমন করে অন্যকে দেখাবেন আত্মদর্শনের পথ? মুণ্ডক উপনিষদের নির্দেশ,— গুরু হবেন 'শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্'। প্রশান্তচিত্ত, শমন্বিত ও ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিরই রয়েছে গুরু হবার যোগ্যতা। প্রকৃত ব্রহ্মজিজ্ঞাসু শিষ্যের প্রথম কাজই তাই গুরু-অন্বেষণ। এ অনেকটা অরণ্যের বহু গাছের মধ্য থেকে মিষ্ট আমগাছটিকে বেছে নেওয়ার মতো। বাগধারায় তাই তো ব্যক্ত— 'গুরু মিলে লাখে তো চেলা মিলে এক।' অবশ্য প্রকৃত গুরুর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা বিপরীত। বহু শিষ্যের মধ্য থেকে প্রকৃত চেলা খুঁজে নিতে হয় তাঁকেও পাকা জহুরির মতোই। গুরু শিষ্যকে বাছেন এক ধরনের শ্রদ্ধার দৃষ্টি থেকে। আবার সমর্থ গুরুর সন্ধান পাওয়ার পরও যে শিষ্য শ্রদ্ধার সঙ্গে গুরুবাক্য গ্রহণ করতে পারেন না।' অভীষ্ট তাঁর কাছে অধরাই থেকে যায়।

তত্ত্বদর্শী সুপণ্ডিত বিশ্লেষকদের অভিমত, হিন্দুধর্মের অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো যোগসাধনা। পৃথিবীর আর কোনো ধর্মে এমন বিজ্ঞান সম্মত যোগসাধনার কথা নেই। অতি জটিল এই যোগসাধনা। নানা বই পড়ে এই যোগসাধনা সম্পর্কে একটা ধারণা গড়া গেলেও এর প্রক্রিয়াগুলি অনুসরণ করতে হলে গুরুর আশ্রয় নিতেই হবে। গুরু ছাড়া যোগসাধনার প্রক্রিয়াগুলি অনুশীলন করতে গেলে হিতে বিপরীত হওয়ার ভয় প্রতি পদে। উপযুক্ত গুরুই কেবল যোগসাধনার গুহ্য প্রক্রিয়াগুলি শাস্ত্রমতে শিষ্যের সামনে তুলে ধরতে পারেন। রহস্যর গ্রন্থি উন্মোচন করে শিষ্যকে চালিত করতে পারেন সঠিক পথে। এ কারণেই হিন্দু ধর্মসাধনায় রয়েছে গুরুর প্রয়োজন।

অবশ্য কেবল যোগসাধনা নয়, হিন্দুধর্ম বা সনাতন ধর্ম হলো বহুমত ও পথের এক অপূর্ব সমন্বয়। আপাতদৃষ্টে এক মনে হলেও হিন্দুধর্মের কাঠামোটি গড়ে উঠেছে বহুত্বকে আশ্রয় করে। এত মত, এত পথ, এত ঐক্য ও অনৈক্য, অস্তি ও নাস্তির এত সমন্বয় অন্য কোনো ধর্মে নেই। দেখতে সহজ সরল মনে হলেও হিন্দুধর্মের পরতে পরতে রয়েছে নানা তত্ত্বের বিস্তার। সেইসময় তত্ত্বের অরণ্যে একলা পথ চলতে গেলে, প্রতি মুহূর্তে থাকে পথ হারানোর আশঙ্কা। তাই হিন্দুধর্মে, বিশেষ করে অধ্যাত্মসাধনায় গুরু হলেন পর্বত অভিযাত্রীর হাতের লাঠি। সেটাই শেষ পর্যন্ত দেয় অমৃতের সন্ধান। গুরুরূপী লাঠি ছাড়া হলাহলকেও মনে হতে পারে অমৃত এবং অমৃতকে বিষ।

অভিজ্ঞ শেরপার সাহায্য ছাড়া অতি দক্ষ পর্বতারোহীও যেমন কোনো শৃঙ্গ অভিযানে যেতে পারেন না, গুরু ছাড়াও তেমনই নিষ্ঠবান শিষ্যও আধ্যাত্মিকতার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছতে পারেন না। শিষ্যের প্রকৃত সাধনার নিষ্ঠা ইত্যাদি পর্যালোচনা করে গুরুই তার উপযুক্ত পথটির দিশা দেখান। এক্ষেত্রে গুরুর ভূমিকা অনেকটা সংসারের মায়ের মতো। মা যেমন পরিবারের প্রত্যেকের ধাত বুঝে একই পদকে এক-একজনের জন্য একেকভাবে তৈরি করে পরিবেশন করেন, গুরুও অনেকটা তাই করেন। একই মাছ দিয়ে মা যেমন কারও জন্য বেশ ঝালমশলার কালিয়া, কারও জন্য সাধারণ ঝোল, পেটরোগা ছেলেটির জন্য যেমন কেবলই নুন হলুদ দিয়ে হালকা ধরনের মাছ রাঁধেন, গুরুও অনেকটা সেই কাজই করেন। শিষ্যের অবস্থা অনুযায়ী ঠিক করে দেন সাধনার ক্রম।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত কাহিনির সিংহের ভূমিকাটিই যেন গুরু। তিনি বলতেন, এক জায়গায় পরিত্যক্ত একটি সিংহশিশু বড়ো হয়ে উঠছিল এক পাল ভেড়ার সঙ্গে। নিজের প্রকৃতি ভুলে ভেড়াদের মতোই ঘাস খেত। তাদের মতোই আচরণ করতো। একদিন এক সিংহ ভেড়ার পালে সিংহশিশুকে ভেড়ার মতো আচরণ করতে দেখে, তার ঘাড় কামড়ে নিয়ে আসে এক জলাশয়ের সামনে। জলে সিংহের ছায়া দেখিয়ে বলে— এটাই হলো তোমার স্বরূপ। তুমি সিংহের মতো আচরণ করো। তুমি কেন থাকবে ভেড়ার পালে তাদের মতো। সিংহশিশু নিজের স্বরূপ দেখে হুংকার দিয়ে ভেড়ার পাল থেকে ছোটে গভীর বনের দিকে। গুরু ওই সিংহের

মতোই শিষ্যকে তাঁর স্বরূপ দেখান। নির্দেশ করেন সাধনার ক্রম।

গুরুই অধিকার ভেদে শিষ্যকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে থাকেন। প্রতিটি মানবশিশুই সমগুণ এবং সমান বল বা ক্ষমতা নিয়ে জন্মায় না। আধুনিক রাজনৈতিক ধুরন্ধররা অবশ্য বলেন, সব মানুষই সমান। এই ব্যক্তিসাম্য গণতান্ত্রিক ভোটাধিকার প্রয়োগের মধ্য দিয়েই আসতে পারে।

কিন্তু ভারতীয় আধ্যাত্মিক জগতে এই রীতি বা নীতি সম্পূর্ণ অচল। অবশ্য কেবল ভারত নয়, প্রাচীন গ্রিসে দার্শনিক অ্যারিস্টটলও বলেছেন একই কথা। মানুষ একই ধরনের অবয়ব নিয়ে জন্মালেও বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, মেধা, চিত্তবৃত্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে নানা বৈষম্য দেখা যায়। এর কারণ নিয়ে নানা মতপার্থক্য রয়েছে, কিন্তু এই বৈষম্য যে বিজ্ঞান সম্মত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গত, চিকিৎসাশাস্ত্রে সব রোগ বা রোগীর জন্য একই ওষুধ বা পথ্য দেওয়া হয় না। একই ভাবে অধ্যাত্ম পথযাত্রীদের জন্যও ঢালাও একই ব্যবস্থার কথা নেই হিন্দুধর্মে। অধিকারভেদে সাধনার প্রকৃতি ও ক্রম নির্দিষ্ট হয়। আর গুরুই করেন সেই কাজটিও। এই কারণেই হিন্দুধর্মে সকলের সাধনা একই রকমের হয় না। নানা জনের রয়েছে নানা ব্যবস্থা। এবং সেটাই হলো হিন্দুধর্মের আরেক বৈশিষ্ট্য। গুরু কেবল পথ দেখান না, বেছে নেন উপযুক্ত শিষ্যকে। আপাত দৃষ্টে যাকে দেখে সকলে চোখ ফিরিয়ে নেয়, উপযুক্ত গুরু তার মধ্যেও খুঁজে পান এক যোগ্য শিষ্যকে। তেমনটাই হয়েছিল সেই মহাভারতের যুগে।

নগরের প্রান্তে একটি তপোবন। সেখানেই আশ্রম গুরু ধৌম্যের। শিষ্যদের গড়ে তোলেন তিনি সবদিক থেকেই। একদিন তাঁর আশ্রম দ্বারে এসে দাঁড়ায় এক কিশোর। বয়সের তুলনায় তাকে একটু বয়স্ক বলেই মনে হয়। বেশ লম্বা-চওড়া, স্বাস্থ্যবান। বেশবাস একটু অপরিচ্ছন্নই। কিন্তু চেহারার মধ্যে রয়েছে একটা মায়া জড়ানো ভাব। কুণ্ঠিতকণ্ঠে বলে কিশোর— আমি উপমন্যু। আশ্রমবাসী হতে চাই। আপনার পদতলে বসে শিক্ষা নিতে চাই। পূর্ণ হবে কি আমার এই আশা?

আশ্রমের অন্যান্য শিষ্যরা তখন উপমন্যুর হাবভাব দেখে কেমন যেন অবজ্ঞাভরে তাকিয়ে থাকে। তারা নিশ্চিত যে গুরু ঠাঁই দেবেন না এমন অমার্জিত একজনকে। ধৌম্য তখনও একদৃষ্টে দেখছেন কিশোরকে। একটু বাদে বলেন, তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর। আজ থেকে তুমি হলে এই আশ্রমবাসী।

উপমন্যুর কিন্তু পড়াশোনার আগ্রহ নেই। সাধন-ভজনেও তেমন মন নেই। তবুও উপমন্যুকে যেন তিনি স্নেহ করেন অন্যদের চেয়ে একটু বেশিই। স্থির পর্যবেক্ষণে ধৌম্য বোঝেন, উপমন্যু একটু বেশি ভোজনবিলাসী। অতিরিক্ত ভোজনের ফলে দেহ হয়ে উঠেছে মেদের পাহাড়। মস্তিষ্কেও বাসা বেঁধেছে তা। সে কারণেই কোনো কাজে উৎসাহ নেই তার। বুদ্ধিও অতি স্থূল।

রোগ নির্ণয় করে ফেলেছেন ধৌম্য। জানেন, মোটা বুদ্ধির হলেও উপমন্যু তাঁকে শ্রদ্ধা করে। তাঁর সব কথা তার কাছে বেদবাক্য। আর তারই সুযোগ নিয়ে তিনি উপমন্যুর ভোজন নিয়ন্ত্রণে তৎপর হন। উপমন্যুকে তিনি দেন আশ্রমের গোধনকে রোজ সকালে মাঠে নিয়ে যাওয়ার ভার। বলেন, সারাদিন গোরু চরিয়ে সন্ধ্যায় সে যেন ফিরে আসে সব গোরু নিয়ে। সঙ্গে দেন অতি সামান্য খাদ্য।

পরম শ্রদ্ধায় গুরুবাক্য পালন করে উপমন্যু। কিছুদিন পরে ধৌম্য লক্ষ্য করেন, উপমন্যুর দেহের মেদ এতটুকুও কমেনি। বরং আগের চেয়ে একটু বেশিই স্থূল হয়েছে। কৌতূহলী গুরু জানতে চান ওই সামান্য খাবার খেয়েও এমন মেদ বৃদ্ধি হচ্ছে কী করে?

উপমন্যু অকপটে জানান, ওই খাদ্যে তার খিদে মেটে না। দুপুরে তার পেটে যেন আগুন জ্বলে। আর তাই সে গোরুর দুধ দুয়ে তা খায়।

ধৌম্য বলেন, ওভাবে দুধ খাওয়া অন্যায়। আজ থেকে আর দুধ খাবে না।

গুরুবাক্য মেনে নেয় উপমন্যু। তবুও তার চেহারা আগের মতোই চকচকে হয়ে উঠেছে দেখে জিজ্ঞাসু গুরু ধৌম্য। উপমন্যু জানায়, দুধ খাওয়ার পর বাছুরদের মুখে যে ফেনা হয় তা পান করে সে রোজ। তাই হয়তো—

গুরু বলেন, অন্যায় করছ তুমি। ওতে বাছুররা কষ্ট পায়। তাই ওই কাজ থেকে বিরত থেকো।

গুরুবাক্য অমান্য করে না উপমন্যু। কিন্তু খিদে সে সহ্য করতে পারে না। খিদের জ্বালায় তাই সে বনের বিষাক্ত পাতা ও ফল খেয়ে ফেলে। তাতেই দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে পড়ে যায় একটা কুয়োয়।

সন্ধ্যায় উপমন্যু ঘরে ফিরল না দেখে ধৌম্য নিজে যান খুঁজতে। গিয়ে দেখেন কুয়োয় পড়ে আছে উপমন্যু দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে। গুরু এবার তাকে একটা মন্ত্র শিখিয়ে দেন। সে মন্ত্র উচ্চারণ করতেই অশ্বিনীকুমাররা আবির্ভূত হয়ে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন। উদ্ধার করেন কুয়ো থেকে।

গুরু তাকে বলেন, অতি লোভেই তোমার এমন সর্বনাশ হয়েছে। লোভ দমন করতে না পারলে পরে আরও বিপদে পড়বে তুমি। তাই সংযত হও।

একথায় উপমন্যুর মধ্যে আসে পরিবর্তন। এবার খাওয়াদাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে সে। ফলে উন্নতি হতে থাকে তার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের। পড়াশোনাতেও মন বসে তার। ক্রমে হয়ে ওঠে এক মহাপণ্ডিত ও সাধক।

উপমন্যুকে এভাবে নতুন করে তৈরি করে ধৌম্য তার কাছে ব্রহ্মা হয়ে ওঠেন। উপমন্যুকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে তিনি হন বিষ্ণু। সবশেষে, মহেশ্বর রূপে তার সব লোভলালসার অবসান ঘটান। আর ওই ভাবে সার্থক করে তোলেন গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই মহেশ্বর— এই মহাবাক্যকে। ❑

মাতৃশক্তি সারদা

ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়

মাতৃশক্তি বলতে কী বুঝি? মা তাঁর শরীরের সকল সারবস্তু দিয়ে নিজ গর্ভে সন্তানকে ধারণ করে অসহ্য যন্ত্রণা অতিক্রম করে শিশুর জন্ম দেন এবং জন্মের পরেও সদ্যোজাতকে স্তন্যপান করিয়ে বাল্যে উপনীত করেন। এ কাজটি মনুষ্য হতে মনুষ্যেতর সকল মায়েরই এক জৈব-কর্তব্য। কিন্তু মনুষ্য-মাতা এর অতিরিক্ত কিছু করে থাকেন। তিনি নিজ সংস্কার, ব্যক্তিত্ব, শিক্ষা ও জীবনাচরণ দিয়ে শিশুর জন্য একটি সদর্থক জগৎ তৈরি করে দেন। এই জায়গাটি তৈরি করতে গিয়ে মা তাঁর প্রভাব সন্তানের উপর ফেলেন। নিজেকে আড়ালে রেখে, নিজের সমস্তটা উজাড় করে দেন মা তাঁর সন্তানের ভালোর জন্য। মাতার ব্যক্তিত্ব যদি শক্তিশালী হয়, শিক্ষা যদি নৈতিক হয়, তবে সন্তান দৃঢ়চেতা ও নীতিবাদী হতেই হবে।

তাহলে মাতৃশক্তি হলো এমন এক শক্তিশালী, দৃঢ়চেতা অথচ স্নেহপ্রবণ নারী-ব্যক্তিত্ব, যিনি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আদর্শ-মাতার অনুপ্রেরণা ও দৃষ্টান্ত নিয়ে উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হন।

কেন মা সারদাকে মনে করি, মাতৃশক্তি!

১. স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ বলছেন, 'পৃথিবীর সকলের প্রতি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভাব। কিন্তু তাঁর পুরুষ-শরীর সেই ভাবের বাঞ্ছিত বিকাশ সম্ভব ছিল না। তার জন্য প্রয়োজন ছিল সমতুল শক্তিসম্পন্ন আরেকটি বিগ্রহের। সেই বিগ্রহ সারদাদেবী। তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মাতৃভাব বিকাশের জন্য রেখে গেলেন।' এক সাধারণ গ্রামের বধূ; যিনি সকলের সামনে চাদরের আড়ালে থাকতেন, ভালো করে কথাও বলতে পারতেন না, তিনি কি আদৌ মাতৃশক্তি হতে পারেন? স্নেহময়ী মাতার নীরব উপস্থিতি যে কত অজস্র সন্তানের অন্তরে প্রসারিত ছিল, তার বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া সম্ভব। শুধু একটিই উদ্ধৃতি দেবো।

দার্শনিক ড.আর.বি. রিবাকভ স্বামী লোকেশ্বরানন্দকে একটি চিঠিতে লেখেন, 'She was an ordinary Indian village girl and He made her into an absolutely outstanding personality which for me is a symbol of India herself. Divine, yet human a real woman, but saintly, the Mother has an irresistible appeal to me.'

২. নিজেকে সাবলাইম করেছেন তিনি, বিলীন করেছেন মা সারদা, প্রতিটি মুহূর্তে। কখনও কোনো শিষ্যা বা ভক্ত যদি বলতেন, মা, তোমার কৃপায় ভালোই আছি। মা রেগে বলতেন, আমার আবার কৃপা কী? বলো, ঠাকুরের কৃপায় ভালো আছো। নিজেকে নেপথ্যে রেখে এভাবেই তিনি সন্তানের মধ্যে প্রসারিত করতেন শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন।

আমরা তাঁকে কতটা মাতৃশক্তি হিসেবে নিতে পেরেছি জানি না। তবে সত্যিই যদি নিতে পারতাম, তাহলে প্রতিদিনের জীবনচর্যায় ছুঁচো-ইঁদুরের দৌড়ে হয়তো নিজের ঢাক নিজে পেটানোর কৃত্য থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখতে পারতাম। ▯

ভারতে বিদেশি আক্রমণ এবং ভারতীয় যোদ্ধা

অমলেশ মিশ্র

ভারতীয়দের রচিত ভারতবর্ষের ইতিহাস আন্দলন। রমেশ চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত History and cultural of Indian people (১১ খণ্ডে) পড়েছেন কম জনই। হুমায়ুনের পরে এবং আকবরের আগে একজন হিন্দু যে দিল্লির সম্রাট হয়েছিলেন একথা স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকে পাওয়া যায় না। তাই আমার মনে হয়, খুব কম ভারতীয়ই একথা জানেন। ভারতে ইসলামি যুগের শাসকদের প্রসঙ্গে তাঁদের নিজ নিজ মনোনীত ব্যক্তিরা মূলত ফার্সি ভাষায় যে সব ইতিহাস লিখেছেন তাও ইতিহাস পাঠ্যপুস্তক প্রণেতারা হয় পড়েননি বা ইচ্ছে করেই উল্লেখ করেননি। তাই ভারতের ইসলামি যুগের ইতিহাস মোহম্মদ ঘোরি থেকে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত (১১৯৩–১৭০৭) আমাদের পুস্তক প্রণেতারা ধর্মনিরপেক্ষতার ঘোরে উল্লেখ করেননি অথবা ভুল উল্লেখ করেছেন। একটি উদাহরণই যথেষ্ট হবে। যেমন শাহজাহান নির্মিত আগ্রার তাজমহল। শাহজাহানের জীবনী নিয়ে তাঁরই নিযুক্ত হামিদ আবদুল লোহরীর লেখা বাদশানামায় পরিষ্কার বলা হয়েছে একটি প্রাসাদ হিন্দু রাজার কাছ থেকে দখল নিয়ে তাজমহল নির্মাণের কথা এবং যে নির্মাণে সাকুল্যে ব্যয় হয়েছিল মাত্র ৪১ লক্ষ টাকা। ইনায়েত খাঁ রচিত শাহাজাহান-নামা, মোহম্মদ কাদেম রচিত আলমগীর নামায় তাজমহল অনুল্লেখিত। ভারতের ইতিহাস প্রণেতাদের কথা নয়, কবিদের কল্পনা ও নাট্যকারদের ভাবাবেগ মানুষের মনে ঢুকিয়ে শাহজাহানের প্রেমের গল্প তৈরি করে এদেশের ধর্ম নিরপেক্ষতার অমর কাহিনি রচিত হয়েছে।

ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাস প্রণেতারা তিনটি বিষয়ে নজর রেখেছেন— (১) ইসলাম অনুরাগী হওয়া, (২) ইসলামি শাসনকে পাদপ্রদীপের আলোতে আনা, (৩) হিন্দুদের বীরত্বকে অন্ধকারে রাখা।

এইকথা বা ইতিহাস খুব কম মানুষই জানেন যে ভারতবর্ষে ইসলাম শাসনকালের ইতিহাস সেই কালের শাসক-নবাবদের বা বাদশাদের নিয়োজিত ইতিহাসকাররাই মূলত ফার্সি ভাষায় লিখে রেখেছেন। এই লেখকরা তাঁদের নবাব ও বাদশাদের যে বীভৎসতার কথা উল্লেখ করেছেন, আমাদের আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাসকাররা তার সামান্যতম উল্লেখ তো করেনইনি বরং উলটো কথাই লিখেছেন। উৎসাহী পাঠকরা—History of India as told by its own History mains-এর আট খণ্ড পড়ে দেখতে পারেন। বইগুলি Elliot and Dowson -এর লেখা ফার্সির অনুবাদ বলা যায়।

বিদেশিরা সুদীর্ঘ ২২০০-২৩০০ বছর ধরে আক্রমণ চালিয়েও ভারতবর্ষ দখল করতে পারেনি কেবল ভারতীয় বীরযোদ্ধাদের বীরত্বের কারণে। একথা খুব দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গেই উল্লেখ করা যায় যে এই বীর যোদ্ধাদের বীরত্বগাথার সঙ্গে দেশপ্রেম, স্বাভিমান ও আধ্যাত্মিকতা যুক্ত ছিল। নিজের দেশের কিছু মানুষের কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা এবং রাজ্যগুলির রাজাদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ বিদেশি আক্রমণকারীদের সুযোগ করে দিয়েছিল। সে সব ক্ষেত্রে ভারতীয় বীর যোদ্ধারা পরাজিত হয়েছেন।

আজ আমরা কবির লেখায় পড়ি—'শক, হুণ দল পাঠান মোগল এক দেহে হ'ল লীন।' যদিও পাঠান ও মোগল লীন হয়নি, বাকিরা হয়েছিল এবং লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এই 'লীন' হওয়ার পিছনে ছিল ভারতীয় যোদ্ধাদের বীরত্ব। যার অনুপ্রেরণা ছিল স্বাভিমান, দেশপ্রেম ও আধ্যাত্মিকতা।

ভারতবর্ষ আয়তনে অনেক বড়ো হওয়ায় সমগ্র ভারতবর্ষ কোনও বিদেশি শক্তি (ইংরেজ-সহ) কোনও কালেই দখল করতে পারেনি।

ভারতবর্ষে ইসলামি আক্রমণ শুরু হয়েছিল ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে। সফলতা পায় ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে পৃথ্বীরাজ চৌহানকে হত্যা করে দিল্লিতে আজমিরের দখল নেয় মহম্মদ ঘোরি। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে মোহম্মদ ঘোরির একজন দাস কুতুবুদ্দিন আইবক নিজেকে দিল্লির শাসক ঘোষণা করে। এই ১২০৬ থেকে ১৭০৭ পর্যন্ত দীর্ঘ ৫০০ বছর ভারতের বৃহত্তর অংশ ইসলামি শাসনে ছিল। ১৭০৭ সালে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হলেও পরবর্তী প্রায় ১৫০ বছর ঔরঙ্গজেবের উত্তরাধীকারীরা নামে মাত্র নবাব ছিলেন। ভারতবর্ষের পরবর্তী ইতিহাস ইংরেজদের দখলে থাকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

ভারতবর্ষে প্রথম বিদেশি আক্রমণ হয় গ্রিকদের দ্বারা। ঘটনা খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে। তখন খ্রিস্টানের উৎপত্তি হয়নি। ইসলাম তো নয়ই। ইসলাম প্রবর্তিত হয়েছিল খ্রিস্টজন্মের প্রায় ৬০০ বছর পরে। অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ১৪০০ বছর আগে।

খ্রিস্টান বা ইসলাম কোনও ধর্ম নয়, রিলিজিয়ন। বিশ্বে ধর্ম একটা এবং সেটি শাশ্বত ও সনাতন। তার জন্মের প্রশ্নই ওঠে না। বাকি যেগুলিকে আমরা ধর্ম বলি, সেগুলিও ধর্ম নয়, মত বা পন্থ। সেগুলি কেউ না কেউ সৃষ্টি করেছে। পরে মানুষ বিশ্বাস করেছে বা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছে। ধর্ম শব্দটির কোনো অনুবাদ বিশ্বের কোনও ভাষাতেই সম্ভব নয়। কিন্তু 'রিলিজিয়ন' শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে যা ডিকশানারিতে পাওয়া যায়।

মুসলমান ও খ্রিস্টান ছাড়া আর যে সব বিদেশি শক্তি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিল তাদের লক্ষ্য ছিল ভূমি ও শাসনব্যবস্থা দখল। তাদের অনেকেই ভারতের সঙ্গে লীন হয়ে গেছে। আপনি অনেক খোঁজাখুঁজি করলেও ভারতে কোন গ্রিক, হুণ বা শক পাবেন না। কিন্তু মুসলমান ও খ্রিস্টান বহু সংখ্যায় পাবেন। এর কারণ হলো ইসলাম ও খ্রিস্টান কেবলমাত্র ভূমি ও শাসনব্যবস্থা দখল নয়, তার সঙ্গে ধর্মান্তরণও তাদের লক্ষ্য ছিল। পরবর্তীকালে ভূমি ও শাসন ব্যবস্থা দখল ভারতীয়দের হাতে এলেও খিস্টান ও ইসলাম ভারতে একাত্ম হয়নি। তাই ভারতীয় মোট জনসংখ্যার মধ্যে খ্রিস্টান ও মুসলমান লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি আছেন— যারা ভারতের স্বীকৃত পূর্ণ

ফঃ ৫

মর্যাদার নাগরিক। প্রথম বিদেশি আক্রমণের সময়টা ৩২৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। হজ্জাজের নেতৃত্বে ভারতে ইসলামি আক্রমণ প্রায় এক হাজার বছর পরে ৭১২ খ্রিস্টাব্দে।

ইতিহাস অনুসারে, ৬৩২ ক্রিস্টাব্দে হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর ৬৩৬— ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দের ছ'মাসের মধ্যে প্যালেস্টইন ও সিরিয়া আরবরা দখল করে নেয়। পরে পরেই পারস্য (ইরাক,ইরান, খোরাসান) তাদের দখলে চলে যায়। ৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে দেখা গেল খলিফাদের রাজত্বের সীমা ভারত সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেছে।

৬৪০—৬৪১ খ্রিস্টাব্দে মিশরের পতন, ৬৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মঙ্গোলিয়া, বুখারা, তাসখন্দ, সমরখন্দ, উত্তর আফ্রিকা দখল করে ৭০৯ খ্রিস্টাব্দে স্পেন দখল করে।

এগুলি কেবল ভূমি ও শাসন দখল নয়; ধর্মীয় আগ্রাসন। সবগুলি দেশ নিজেদের ধর্ম বিসর্জন দিয়ে ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম কবুল করল। সেখানে ইসলামি শাসন কায়েম হলো। হজরত মহম্মদ নিজে প্রথমে মদিনা পরে মক্কা দখল করেন। এই দখলগুলি বীরত্বগাথা হিসাবে ইসলামি ঐতিহাসিকরা রচনা করে গেছেন। বীভৎসতার কথাও বীরত্বব্যঞ্জক করা হয়েছে। কিন্তু ভারতের মাটিতে পা রাখতে মোহাম্মদের মৃত্যুর পর ৮০ বছর সময় লেগেছিল। আক্রমণ শুরু হয়েছিল খলিফা ওমরের আমলে (৬৩৪-৬৪৪)। মহারাষ্ট্রের ঠানে ও গুজরাটের ভারুচে ইসলামি আক্রমণ প্রতিহত হয়। ইসলামি বাহিনীর নেতা মুখ্ইরাহ্ কেবল আক্রমণ করতে গিয়ে পরাজিত ও নিহত হয়। খলিফা ওমর চাইল স্থলপথে সিন্ধুপ্রদেশের মাকরাল শহর আক্রমণ করতে। কিন্তু ইরাকের শাসনকর্তা আপাতত তাঁকে হিন্দুস্থান অভিযান করতে নিষেধ করল। পরামর্শমতো পরবর্তী খলিফা ওসমান (৬৪৬-৬৫৬) হিন্দুস্থান আক্রমণে অগ্রণী হলো না। জলপথ বা স্থলপথ কোনও পথেই ভারতবর্ষ আক্রমণে রাজি হলো না।

খলিফা আলি (৬৫৬-৬৬১) ৬৬০ সালে স্থলপথে একটি অভিযান পাঠাল, কিন্তু সেই বাহিনীর সেনাপতি-সহ প্রায় সকলেই ৬৬২ খ্রিস্টাব্দে কিকনানে নিহত হলো। এইভাবে পরপর চারজন খলিফার জীবন অবসান হলো কিন্তু হিন্দুস্থানের মাটি দখলে করতে পারল না। পরবর্তীকালে খলিফা সোয়াইরিয়ার কালে (৬৬১–) ছ'টি অভিযান হয় স্থলপথে। একটি ছাড়া সবগুলিই পর্যুদস্ত হয় ভারতবর্ষে। সর্বশেষ অভিযান কিঞ্চিৎ সফল হয়। ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু প্রদেশের মাক্রাল ইসলামি দখলে আসে।

ভারতবর্ষে হিন্দুদের প্রবল প্রতিরোধের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার ভিত্তিতে পরবর্তী ২৮ বছর ভারতের সিন্ধুপ্রদেশ বা অন্যত্র কোনো আক্রমণ হয়নি। আবার ৭০৮ খ্রিস্টাব্দে দুবার দেবল দখলের অভিযান হয়েছিল। এই দুই অভিযানের দুই নেতা উবাইদুল্লাহ ও বুদাইল সসৈন্যে নিহত হয়। ইরাকের শাসক হজ্জাজ আবার আক্রমণ করতে চাইলে খলিফা তাকে নিষেধ করে। লিখিতভাবে জানায় যে আগের আক্রমণগুলিতে বহু মুসলমান নিহত হয়েছে, আপাতত হিন্দুস্থান আক্রমণের চিন্তা না করাই ভালো।

কিন্তু হজ্জাজ পরবর্তী চার বছর ধরে বিশেষ সৈন্যবাহিনী গঠনে ব্রতী হলো। তার ভাইপো তথা জামাতা মহম্মদ-বিন-কাসেমের সেনাপত্যে ৭১২ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুস্থান অভিযান হলো। হজ্জাজ বলল, আমি আল্লাহর নামে শপথ করছি যে এই অভিযানের পিছনে ইরাকের সমূহ সম্পত্তি যা আমার অধিকারে আছে তা ব্যয় করব।

৭১৩ সালে ইসলামি বাহিনী দুদ্ধর্ষ প্রতিরোধের সম্মুখীন হলো। সিন্ধু ও মুলতান দখল করল। কয়েকজন হিন্দু বিশ্বাসঘাতক তাদের সাহায্য করেছিল। তবু কিছুকাল পরেই ৭১৪ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুরা পুনর্দখল করল। কেবল দেবলপুর থেকে সমুদ্র পর্যন্ত একটি সঙ্কীর্ণ এলাকা আরবদের দখলে থাকল।

কিন্তু ভারতবর্ষে ইসলাম আক্রমণের অনেক আগেই প্রায় এক হাজার বছর আগেই ভারতবর্ষে বিদেশি আক্রমণ শুরু হয়েছিল। ভারতের সম্পদই ভারতে বিদেশি আক্রমণকারীদের প্রলুব্ধ করেছিল।

ভারতে বিদেশি আক্রমণগুলির মধ্যে ইসলামি আক্রমণই ছিল অধিকতর ভয়াবহ। উদ্দেশ্যও পৃথক ছিল। অন্যান্য আক্রমণকারীরা এদেশের ধনসম্পদ সম্পর্কেই একমাত্র আগ্রহী ছিল। ভারতের তদানীন্তনকালে প্রচলিত ধর্ম অর্থাৎ সনাতন ধর্ম, যা পরবর্তীকালে হিন্দুধর্ম হিসাবে পরিচিতি পেয়েছিল, সেই সনাতন ধর্মব্যবস্থায় তারা হস্তক্ষেপ করেনি। কিন্তু ইসলামি আক্রমণের লক্ষ্য ছিল দ্বিবিধ। প্রথমত, তারা সনাতন ধর্ম ব্যবস্থাকে বাতিল করে ইসলাম প্রচলনে আগ্রহী ছিল—যা অন্যান্য দেশে তারা আক্রমণ করে করতে সমর্থ হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, আরবের রুক্ষ ভূমি ও জলবায়ু থেকে ভারতের শস্য শ্যামলা ভূমি, জলবায়ু এবং ধনসম্পদ তাদের প্রলোভিত করেছিল।

ভারতে বিদেশি আক্রমণ প্রসঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো অন্যরা যুদ্ধসংক্রান্ত নিষ্ঠুরতা করেছিল ঠিকই এবং যুদ্ধের ক্ষেত্রে তা সঙ্গতও ছিল। কিন্তু ইসলাম আক্রমণকারীরা যুদ্ধ সংক্রান্ত ও সঙ্গত নিষ্ঠুরতা ছাড়াও সাধারণ অবস্থাতেও নিষ্ঠুরতা করত এবং তার বীভৎসতা ছিল কল্পনার উর্ধ্বে। ইসলাম আক্রমণকারীদের সেই নিষ্ঠুরতার ইতিহাস কিছুটা হলেও জানা যায় টি. এম ইলিয়ট এবং ডওসল রচিত History of India as told by its own Historians পুস্তকের ৮টি খণ্ডে । আর রবীন্দ্রনাথ রচিত—বন্দী বীর কবিতাটি পড়লেও কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যাবে।

অমুসলমানদের ক্ষেত্রে মুসলমানদের এই বীভৎস নিষ্ঠুরতা তাদের ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে জায়েজ বা বৈধ।

আগেই উল্লেখ করেছি যে ভারতে ইসলামি শাসনের প্রায় এক হাজার বছর আগে থেকেই বিদেশি আক্রমণ শুরু হয়েছে—খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫-৩২৬ অব্দ থেকে। আরব আক্রমণের আগের আক্রমণগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশ জয়, সাম্রাজ্য বিস্তার, ভালো জীবন যাত্রার সুযোগ এবং খ্যাতি লাভ। আরবদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষকে ইসলামিস্থান করা।

বিদেশি আক্রমণকারী যারাই হোক বা যে উদ্দেশ্যেই আক্রমণ হয়ে থাকুক না কেন আমাদের শুধু খেয়াল করতে হবে যে ভারতের স্বাভিমানী, দেশপ্রেমী যোদ্ধারা স্বধর্ম ও স্বদেশ রক্ষার জন্য আমরণ যুদ্ধ করেছেন এবং দেশ ও ধর্মকে সুরক্ষিত রেখেছেন। এই বীরত্বের দিকে ইতিহাস লেখকরা ইঙ্গিত করলেন না। তাঁরা বিদেশিদের পরাক্রম ও জয়গাথাই লিখেছেন, ভারতের পরাক্রমী যোদ্ধাদের অবহেলা করেছেন। □

অতিপ্রবীণরা শেয়ার বাজারের সঙ্গে নিজেদের কতটা জড়াবেন?

শেখর সেনগুপ্ত

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুযোগ্য নেতৃত্বে ভারত যে আজ বিশ্বের তাবৎ দেশসমূহের মধ্যে অর্থনীতিতে যথার্থ বলীয়ান প্রথম চারটি দেশের একটি, তা নিয়ে আর দ্বিমতের অবকাশ নেই এবং এই নিয়ে জবানবন্দি দেবার বা নেবার মতো পরিবেশ বহু রাজ্য নিয়ে গঠিত এই দেশে আর নেই বললেই চলে। ভারতের অন্তর্নিহিত এমত শক্তি যে আদৌ কোনও দৈব প্রহেলিকা নয়, তা অনুভব করা যায় এখানকার স্টকমার্কেটের দিকে খেয়াল রাখতে পারলে। স্টকমার্কেটে বিনিয়োগকারীরা সর্বদাই দু'হাত বাড়িয়ে থাকেন শেয়ারবাজার থেকে উড়ে আসা গরম টাকা লুটে নিতে। এ কাজে তাঁদের উত্তেজনা, আনন্দ, হতাশা ইত্যাদি থাকলেও বিরক্তি নেই বললেই চলে। চোখাচোখি হলেই হনহনিয়ে চলে আসে বাজারচর্চা। বহু বছর একটি অতিবৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পদস্থ আমলারূপে কর্মরত থাকবার সুবাদে আমি বুঝতে পারতাম, ইত্যাকার বিনিয়োগকারীদের মনজুড়ে কী প্রত্যাশা অথবা হতাশা যেন দিনের শেষ লালচে আভা বিস্তার করে চলেছে অনর্গল। তাঁরা কখনও উল্লসিত, কখনও বিষাদগ্রস্ত অথবা বড়ো ক্লান্ত। আজ শেয়ার কিনে দু'-দশ দিনের মধ্যেই বাজারজাত করবেন এবং মুঠোকয়েক লাভের কড়ি পকেটে ঢুকিয়ে লাফাতে লাফাতে বাড়িতে ফিরবেন। কিন্তু যে সকল শেয়ারপত্রকে অর্থনীতির পরিভাষায় 'ব্লু চিপস' আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে, তাদের বাজার মোতাবেক সঠিক চিহ্নতকরণ আদৌ জলবৎ কর্ম নয়। বিশেষত শেয়ার বাজারে যারা লগ্নীকারীরূপে নিতান্ত নবীন, তাঁরা প্রকৃত ব্লু চিপকে শনাক্ত করতে প্রায়শ বিভ্রান্তির দ্বারা আক্রান্ত হন এবং পরিশেষে কপালও চাপড়াতে হতে পারে। আমি তাঁদের সবিনয়ে জানাই, ওই সকল উঠতি কিংবা সম্ভাবনাপূর্ণ কোম্পানিগুলিকে আগে সঠিকভাবে শনাক্ত করুন তারপর নিজের বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও মেধাকে শান দিয়ে আপনাকে অন্তর্ভুক্ত করুন বিনিয়োগকারীদের তালিকায়। বর্তমানে বি জে বি পরিচালিত আর্থিক পরিমণ্ডলে যে সকল সংস্থায় উদ্যোগ বেড়েছে, মুনাফালাভের আবহও যেখানে ক্ষণজীবী নয় তথা কোনও বিপর্যয়ের আগাম বার্তা নেই, আপনি নিজেকেই বাধিত করুণ সেই সকল সরকারি বেসরকারি সংস্থায় শেয়ার কিনতে এবং অধিকতর সুসময় এলে তা বেচে দিতে।

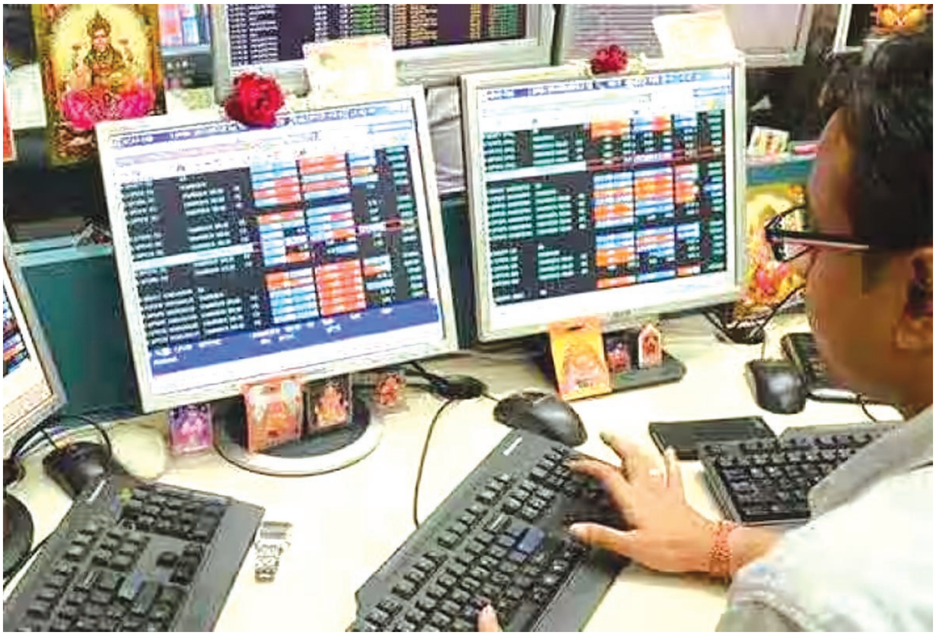

যাঁদের বয়স অনেক এবং যাঁরা বিভিন্ন সঞ্চয়প্রকল্পে বিনিয়োগ করে তা থেকে লব্ধ নিয়মিত নির্দিষ্ট উপার্জনে জীবনের বাকি দিনগুলি কাটিয়ে দিচ্ছেন, তাঁদের কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ শেয়ার বাজারে সঞ্চয়ের বড়ো একটা অংশ লগ্নি না করাই বাঞ্ছনীয়।

জানি, একজন চাকরিরত মধ্যবিত্তের পথে গোটা শেয়ারবাজারকে চষে ফেলা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্র অধিক নয়, প্রথমে মাত্র গোটা দশেকে মাঝারি অথবা বড়ো কোম্পানিকে বেছে নিন। তারপর তন্নিষ্ঠ অসুসন্ধানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলির নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে নিজেকে যথাযথভাবে অবহিত

করুন মার্কেট সার্ভের মাধ্যমে ঃ

(ক) পরিচালকমণ্ডলী কতখানি দক্ষ, অভিজ্ঞ ও পেশাদার;

(খ) কোম্পানির দ্বারা উৎপাদিত বস্তু তথা পণ্যের বর্তমান চাহিদা কতটা এবং ভবিষ্যতে তা কোথায় গিয়ে পৌঁছতে পারে;

(গ) উৎপাদন ব্যবস্থাপনাকে যথাযথ আধুনিক ও বাজারমুখী করে তোলার জন্য ম্যানেজমেন্টের কোনও সুচিন্তিত পরিকল্পনা আছে কিনা;

(ঘ) শ্রমিক ও কর্মীদের সংখ্যা সীমিত রেখে কর্মরতদের বেতন কাঠামোকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর উচ্চতর স্তরে উন্নীত করা হয় কিনা মালিক-শ্রমিক দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে;

(ঙ) বিগত অন্তত তিন বছর যাবৎ কোম্পানির মুনাফার গতিকে উর্ধ্বমুখী রাখা সম্ভব হয়েছে কিনা;

(চ) কোম্পানির শেয়ার হোল্ডাররা যেন ঠিক ঠিক তাঁদের প্রাপ্য লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন সূচনা থেকেই।

(ছ) নিট লাভের একাংশকে মূলধনরূপে যেন ব্যবহার করা হয়।

(জ) কোম্পানির মালিকের যদি অন্য আরও ব্যবসা থাকে, তিনি কি সংশ্লিষ্ট লাভজনক সংস্থা থেকে লাভের কড়ি সেই ব্যবসায় বিনিয়োগ করে থাকেন? যদি করে থাকেন, সেটা কাম্য হবে না।

এই সকল প্রশ্নের উত্তর আশাব্যাঞ্জক হলে ওই সংস্থার শেয়ার ক্রয় আপনার নিকট লাভজনক বিনিয়োগ হয়ে উঠতে পারে।

এছাড়া শেয়ার বাজারে অর্থলগ্নির আগে আপনি অবশ্যই অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবার চেষ্টা করবেন ভারতীয় স্টকমার্কেটের নিয়ামক SEBI নির্দেশিত নিম্নোক্ত নির্দেশাবলীকে।

যা করবেন (DOs) ঃ

(১) শুধুমাত্র স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে লেন-দেন করবেন।

(২) সেবি অনুমোদিত সংস্থা অথবা ব্যক্তিসংগঠনের মাধ্যমে লেন-দেন করা বিধেয়।

(৩) যাবতীয় নিয়মাবলীকে মান্যতা দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলুন।

(৪) 'Know your client agreement form' চেয়ে নিয়ে তাতে স্বাক্ষর দিন।

(৫) সাবধানে পড়ে দেখুন এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে উপলব্ধি করুন শেয়ার/প্রত্যয়সিদ্ধ পরে বিনিয়োগ তথা লেন-দেন কী পরিমাণ ঝুঁকি আপনাকে বহন করতে হবে।

(৬) যত ধরনের প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন আপনার মাথায় আসছে লেন-দেন শুরু হবার পূর্ববর্তী সময়ে, তাদের প্রতিটির সদুত্তর জেনে নিন শেয়ারবাজার সমেত অর্থনীতিচর্চায় অভ্যস্ত তথা পরিণত মস্তিষ্ক বিজ্ঞজনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে।

(৭) প্রথমেই মুঠো খুলে টাকা ঢালতে যাবেন না। দাবি করুন চুক্তিপত্রটিকে এবং স্বয়ং তার বিশ্লেষণ করুন।

(৮) আপন বিনিয়োগ সম্পর্কিত কাগজপত্রাদির অলিগলিগুলিকে এমন সর্তকতার সঙ্গে রক্ষা করবেন, যাতে কেউ ওইগুলিকে ঘাঁটাঘাটি করবার সুযোগ না পায়।

(৯) যদি লেন-দেনের প্রয়োজন খুব ঘন ঘন দেখা না দেয়, তাহলে D'mat account-টিকে নিষ্ক্রিয় রাখবার যে সুবিধা রয়েছে, তার সুবিধা নিন।

(১০) কোনও অভিযোগ থাকলে উপযুক্ত প্রতিকারের জন্য যথার্থ কর্তৃপক্ষের নিকট নালিশ দায়ের করবার তোড়জোড় শুরু করে দিতে দ্বিধা করবেন না।

যা করবেন না ঃ

(ক) নথিযুক্ত নন, এই রকম ব্যক্তি কিংবা সংস্থার মাধ্যমে শেয়ার বেচা-কেনা করবেন না। অন্যথায় প্রতারিত হবার সম্ভাবনা পর্যাপ্ত। (খ) মাত্রাহীন মুনাফাপ্রাপ্তির গল্প যারা শোনান, তাঁদের এড়িয়ে যাওটাই বুদ্ধিমানের কাজ। (গ) বাস্তবকে খতিয়ে না দেখে গুজব কিংবা উড়ো ও ধোঁয়াশা বক্তব্যে প্রভাবিত হয়ে টাকা লগ্নির পথে হাঁটবেন না। স্বপ্নে ভাসমান ব্যক্তির শেয়ার বাজারে লগ্নি করা অনুচিত। (ঘ) মনে রাখবেন, আপনার ডি-ম্যাট অ্যাকাউন্টটি গুরুত্ববাহী। ওই অ্যাকাউন্টের প্রত্যার্পণ নির্দেশিকাপত্রের শূন্যস্থানে স্বাক্ষর করে তা অরক্ষিত স্থানে ফেলে রাখবেন না। নিজের সুরক্ষিত গোপন স্থানেই রাখবেন অপরের সম্ভাব্য কৌতূহলকে এড়িয়ে।

প্রশ্ন ওঠে, একজন প্রবীণ ব্যক্তির পক্ষে স্টকমার্কেটে কতটা অংশগ্রহণ যুক্তিযুক্ত? অবশ্য বয়সের এই অধিক-অনধিক মাত্রাকে মাপতে গেলে জানা দরকার, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্টকমার্কেট সম্পর্কে অভিজ্ঞতার বহর ও গভীরতা কতটা? অনভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে বৃহৎ বিনিময় বিপর্যয়কে ডেকে আনবার নজির অজস্র আছে। আমার নিজের অভিমত, যাঁদের বয়স অনেক এবং যাঁরা বিভিন্ন সঞ্চয়প্রকল্পে বিনিয়োগ করে তা থেকে লব্ধ নিয়মিত নির্দিষ্ট উপার্জনে জীবনের বাকি দিনগুলি কাটিয়ে দিচ্ছেন, তাঁদের কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ শেয়ার বাজারে সঞ্চয়ের বড়ো একটা অংশ লগ্নি না করাই বাঞ্ছনীয়। তবে ধৈর্য ও সামর্থ্যের মেলবন্ধন ঘটেছে যাঁদের মধ্যে, তাঁরা বাজারকে স্টাডি করে, অভিজ্ঞজনের অভিমত নিয়ে বাছাই করা নামি কোম্পানির শেয়ার নিয়ে রেখে শুভদিনের অপেক্ষায় থাকতেই পারেন। কারণ, এমতো ইক্যুইটি কিনে রাখলে অধিকাংশ বিনিয়োগকারীই যথাকালে লাভের মুখ দেখবেন। এই সব ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ Short term view অপেক্ষা Long term view সর্বদাই কাম্য।

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ ব্যাংক আধিকারিক)

জেদ ও অধ্যবসায় দ্বারা সফল লক্ষ্যভেদ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ উত্তরাখণ্ডের হাতে গোনা শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে ড. কমল ঘনসালা একজন, যিনি দূরদর্শী চিন্তাধারা ও আত্মবিশ্বাসের জোরে অর্জিত সাফল্যের মাধ্যমে আজ দেশের যুব সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণাস্বরূপ হয়ে উঠেছেন।

১৯৬৮ সালের ১৫ এপ্রিল নৈনিতালে তাঁর জন্ম হয়। ১৯৯২ সালে

কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি কম্পিউটার সায়েন্স বিষয়ে স্নাতক উত্তীর্ণ হন। ২০০৬ সালে তিনি এম.টেক উত্তীর্ণ হন। বাড়িতে তিনি স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছিলেন যে তিনি চাকরি নয়, ব্যবসায় আগ্রহী।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি ভাবতাম যে দেরাদুনকে শিক্ষার কেন্দ্র বলা হলেও এখানে কম্পিউটার শিক্ষার কোনো সুযোগ নেই। দেরাদুনে কম্পিউটার শিক্ষা প্রচলনের প্রবল জেদ আমার মাথায় চাপে। কিন্তু আমার পরিবারে কেউ কোনোভাবে ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত না থাকার কারণে সেই কাজটি মোটেই সহজ ছিল না।' ১৯৯৩ সালে তিনি বাবার থেকে ২৯ হাজার টাকা নিয়ে কম্পিউটার কেনেন এবং একটি ঘর নিয়ে 'গ্রাফিক এরা' নামে একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সূচনা করেন। তিনি গ্রাফিক ডিজাইনার হওয়ার দরুন এই সংক্রান্ত প্রচুর কাজও পেতে থাকেন। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এনআইটি)-তে কম্পিউটার কোর্সের খরচ ৩,৫০০ টাকা হলেও তাঁর স্থাপিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মাত্র ৩০০ টাকায় এই কোর্স করা যেত।

তিনি আরও বলেন, '১৯৯৫ সাল থেকে হার্ডওয়্যার কোর্সের সঙ্গে কম্পিউটার সফট্‌ওয়্যার প্রোগ্রামিং পড়ানো শুরু করলাম এবং কম্পিউটার সেন্টারটির কাজের পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই প্রয়াসের ফলে সেন্টারের জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কোনো ব্যাংক ঋণ দিতে চায়নি। তারপর বাজার থেকে সুদের বিনিময়ে টাকা ধার করতে বাধ্য হই। অনেকেই ব্যবসায়িক অংশীদার হতে চাইলেও এই উদ্যোগে আমি কাউকে অংশীদার হিসেবে চাইনি। কারণ এর ফলে আমার লক্ষ্য, আমার স্বপ্ন বাধা প্রাপ্ত হতো। ২০০১ সালের মধ্যে ছাত্রদের হাতে আই.টি (তথ্য-প্রযুক্তি)-র বিষয়ে সরকারি অনুমোদিত ডিগ্রি তুলে দেওয়ার লক্ষ্যে পৌঁছে যাই।'

এইভাবে, সুস্পষ্ট লক্ষ্য, ভালো কিছু করার অদম্য জেদ, সদর্থক চিন্তাধারা, প্রবল আত্মবিশ্বাস, আই.টি কুশলীদের নিয়োজনের মাধ্যমে টিমওয়ার্ক ও অনুশাসনের দৌলতে ২০০৮ সালের ১৮ আগস্ট 'দেরাদুনে গ্রাফিক এরা ডিমড্ ইউনিভার্সিটি' স্থাপনে তিনি সফল হন। হিমালয়স্থিত এই রাজ্যে টেকনিক্যাল বা কারিগরি বিষয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগের অভাবে থাকার কারণে ২০১১ সালে তাঁরই উদ্যোগে স্থাপিত হয়— 'গ্রাফিক এরা হিল ইউনিভার্সিটি'। দেরাদুন গ্রামীণ এবং কুমায়ুনের ভীমতালে এই ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস খোলা হয়। কোর্স ফি-এর ক্ষেত্রে হিমালয় স্থিত রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের ছাড় দেওয়া হয়।

২০২০ সালে হল্‌দওয়ানিতে শুরু হয় আরেকটি ক্যাম্পাস। এর আগে ২০১৫ সালে দেরাদুনে তিনি দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনার সুযোগ সম্পন্ন 'গ্রাফিক এরা গ্লোবাল স্কুল' স্থাপন করেন। এখন তিনি দেরাদুনে ৬০০ বেডের 'গ্রাফিক এরা মেডিক্যাল কলেজ' তৈরি করছেন। তাঁর স্থাপিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পাঠরত প্রায় ২৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এবং প্রায় ২ হাজার শিক্ষক কর্মরত থাকা ছাড়াও, এই প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে পরোক্ষে প্রায় ৫০ হাজার লোকের আয়ের সংস্থান হয়। এছাড়াও গবেষকদের গবেষণালব্ধ বিষয়ের স্বীকৃতি বা পেটেন্ট সংক্রান্ত উদ্দেশ্যে উত্তরাখণ্ডের মধ্যে তাঁর সংস্থাই প্রথম কাজ শুরু করে। তাঁর তৈরি প্রতিষ্ঠান বিশ্বের মধ্যে শীর্ষ ২০০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্থানাধিকার করেছে।

সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গেও ড. ঘনসালা প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত। উত্তরকাশী, কেদারনাথ ও যোশীমঠে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আক্রান্ত ১০৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকেতিনি বিনা মূল্যে শিক্ষাদান করতে সাহায্য করেছেন। খেলাধুলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে পদকজয়ী ক্রীড়াবিদ্‌দের উৎসাহিত করতে আর্থিক সহায়তা দান করেছেন। তাঁর স্থাপিত 'গ্রাফিক এরা গ্রুপ কোম্পানি'-র বর্তমানে বার্ষিক ব্যবসার পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকা। ইতিবাচক মানসিকতা ও শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে প্রবল আত্মবিশ্বাসী এই শিক্ষাবিদ্ শিক্ষানুরাগী ছাত্র ও গবেষকদের কাছে অনুপ্রেরণার এক উজ্জ্বল উৎস। □

স্বাস্থ্য রহস্য

বহুদিন আগের কথা। তখন ভারতবর্ষের সুবর্ণযুগ। একবার সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত তীর্থ পর্যটনে বেরিয়ে কাশী দর্শনে যাচ্ছিলেন। উদ্দেশ্য, বাবা বিশ্বনাথের পূজা দিয়ে রাজ্যের প্রজাদের মঙ্গল কামনা করা। যেখানেই রাত্রি হতো সেখানেই শিবির স্থাপন করে তিনি রাত্রিবাস করতেন। সকালবেলা স্থানীয় গরিব-দুঃখীদের দানধ্যান করে, তাদের খোঁজখবর নিয়ে আবার রওনা হতেন।

একদিন সন্ধ্যায় এক বিশাল আমবাগানে শিবির স্থাপন করা হলো। সবাই যথারীতি খাওয়াদাওয়া করে বিশ্রাম নিতে গেলেন। সম্রাটও তাঁর পালঙ্কে শুয়ে পড়লেন। কেবলমাত্র রক্ষীরা পাহারায় রইল। কিন্তু সম্রাটের কিছুতেই ঘুম আসছিল না। দুপুর রাতে তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

সেই শিবিরেই অন্য একটি তাঁবুতে রাজবৈদ্য ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি এসে সম্রাটের চিকিৎসা শুরু করলেন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সম্রাট সুস্থ হয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, এই আমবাগানের আশেপাশের গ্রামের লোকেরা অসুস্থ হলে তাদের চিকিৎসা কীভাবে হয়। তাদের জন্য তো কোনোদিন ভাবা হয়নি। এরকম ভাবতে ভাবতে সম্রাট ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম ভাঙল তাঁর একেবারে সকালে।

সকালে দানধ্যান করার পর তিনি রাজবৈদ্য ও তার সহকারীকে ডেকে পাঠালেন। রাজবৈদ্যের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি সহকারী বৈদ্যকে আশেপাশের গ্রামের জন্য স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করলেন এবং নির্দেশ দিলেন একটি ভালো চিকিৎসাকেন্দ্র তৈরি করে ওখানেই থেকে যেতে। নিযুক্ত করা বৈদ্য ওই গ্রামেই থেকে গেলেন। সম্রাট কাশী অভিমুখে রওনা হলেন।

ওই বৈদ্য কয়েক মাসের মধ্যে ওখানে একটি ভালো চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে তুললেন। বেশ কয়েকজন সহকারী বৈদ্যও নিযুক্ত করলেন। সেখানে একটি গুরুকুল ছিল। গুরুকুলে একশো বিদ্যার্থী পড়াশোনা করত। একদিন ওই বৈদ্যর মনে চিন্তা এল, তারা কি এখানে বৃথা সময় নষ্ট করছে? বেশ কয়েক বছর হলো এখানে চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে কিন্তু এরমধ্যে একজনও কেউ অসুস্থ হয়ে চিকিৎসাকেন্দ্রে আসেনি। এমনকী গুরুকুলের কোনো বিদ্যার্থীও আসেনি।

একদিন প্রধান বৈদ্য হাঁটতে হাঁটতে গুরুকুলে এলেন। একজন আচার্যকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এই গুরুকুলে কিংবা আশেপাশের গ্রামের মানুষদের কি অসুখবিসুখ হয় না বা তারা সঙ্কোচবশত চিকিৎসাকেন্দ্রে আসেন না?

আচার্য ওই বৈদ্যকে বললেন, কোনোদিন কেউ এখানে চিকিৎসা করাতে আসবেও না। কেননা, এই গুরুকুলের বিদ্যার্থী এবং আশেপাশের গ্রামের লোকেরা সবাই জনজাতি সমাজের। তারা সবাই প্রচণ্ড শারীরিক পরিশ্রম করে। তারা কেউ খিদে না পেলে খায় না, সে যতই লোভনীয় হোক না কেন । সবাই মিতাহারী। ক্লান্ত না হলে তারা বিশ্রামও করে না। খাবার সময়ও তারা পেট খালি রেখেই খায়। এজন্য তারা কেউ অসুস্থও হয় না।

আচার্য আরও বললেন, এদের সমাজের নিয়ম হলো, খিদের চেয়ে কম খেতে হবে। আর সৎভাবে উপার্জিত ধনেই ভোজন সামগ্রী সংগ্রহ করতে হবে। এরা জানে, সুস্থ থাকার জন্য প্রতিদিন পরিশ্রম করতে হবে, আর ঘামও ঝরাতে হবে। শুধু তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে মনটাকেও পবিত্র রাখতে হবে।

আচার্যের মুখে এসব শুনে প্রধান বৈদ্য একাকার লোকেদের স্বাস্থ্যরহস্য বুঝতে পারলেন এবং ফিরে গিয়ে সম্রাটকে সবকথা বললেন। শুনে সম্রাটও খুব প্রভাবিত হয়েছিলেন।

সংগৃহীত

বীর বনবাসী

গোবিন্দ গুরু

জন্ম ১৮৫৮ সালের ২০ ডিসেম্বর রাজস্থানের ডুঙ্গরপুর জেলার বাসিয়া গ্রামে। স্ত্রী ও একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পর তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি ভীল জনজাতিদের সংগঠিত করে আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করার জন্য সম্প সভা স্থাপনা করেন। এই সভার নিয়ম ছিল নেশা করা চলবে না। নিত্য স্নান করতে হবে। প্রতিদিন ঈশ্বরের পূজা ও যজ্ঞ করতে হবে। চুরি, ডাকাতি করা চলবে না। গ্রামে গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।। গরিবদের সাহায্য করতে হবে। গ্রামের গণ্ডগোল গ্রামেই মিটিয়ে ফেলতে হবে, আদালতে যাওয়া চলবে না। জমিদারের বেগার খাটা চলবে না। অন্যায়ের বিরোধিতা করতে হবে এবং স্বদেশি জিনিস ব্যবহার করতে হবে। এরজন্য তিনি ব্রিটিশ শাসকের রোষানলে পড়েন। সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে। জেল থেকে মুক্ত হয়ে তিনি ভীলদের সেবাকাজে মনোনিবেশ করেন। ১৯৩১ সালের ৩০ অক্টোবর তিনি পরলোকগমন করেন।

এসো সংস্কৃত শিখি– ৪

(স্ত্রীলিঙ্গে)

সা বালিকা। সে বালিকা।

সা কা? সে কে?

সা গায়িকা। সে গায়িকা।

এভাবে বলতে হবে—

সা মালতী। সা বর্ণালি। সা মানসী। সা সরস্বতী। সা শ্যামলী। সা মৌমিতা। সা সাগরিকা।

অভ্যাস করি–

রবিনা, বিদিশা, সর্বাণী, মধুরিমা, মধুমিতা, শ্রাবণী, কঙ্কনা, অঙ্কিতা, শ্রেয়া, নিকিতা, কাজল, বৈশালী, প্রিয়াঙ্কা, সোমা, তনুজা, অনুষ্কা।

ভালো কথা

বাবুইপাখির কথা

গত সপ্তাহে আমার বাবা প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে ফেরার সময় দেখেন তালগাছের তলায় একটা বাবুইপাখির বাসা পড়ে আছে। ওই গাছে সারা বছর বাবুইপাখি বাসা বেঁধে থাকে। একটা যেন কীভাবে পড়ে গিয়েছে। বাবা বাসাটি হাতে নিয়ে দেখে তাতে দুটো ছানা চিঁচিঁ করছে। অনেক উঁচু তালগাছ তাই বাবা বাসাটি বাড়িতে এনে বারন্দায় উঁচুতে ঝুলিয়ে রাখে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুটো বাবুই মনে হয় ছানাদুটির মা-বাবা এদিক ওদিক দেখে বাসায় এসে বসল। তারপর উড়ে গিয়ে ঠোঁটে করে খাবার এনে খাওয়াতে লাগল। এখন ছানাদুটো বড়ো হয়েছে। ওদের মা-বাবা খাবার নিয়ে বাসায় এলেই ওরা মুখ বাড়িয়ে খেয়ে নেয়। আমি একদিন টুলের উপর উঠে ছানাদুটোর গায়ে হাত বুলিয়ে দিলাম। ওরা একটুও ভয় করছিল না।

স্বপ্না মহান্তি, সপ্তমশ্রেণী, বরাবাজার, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

চিল

ঐন্দ্রিলা মহান্ত, নুড়াইপাড়া, সিড়ড়ী, বীরভূম।

ডোবা নালা খাল বিল
ছাড়িয়ে যে ওড়ে চিল।
আকাশটা কত নীল
ওর সাথে নেই মিল।

ফুল হাসে খিল খিল
জেগে আছে মাঠ ঝিল।
মাছ খেয়ে নিল চিল
আয় ছুঁড়ে মারি ঢিল।

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব
কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

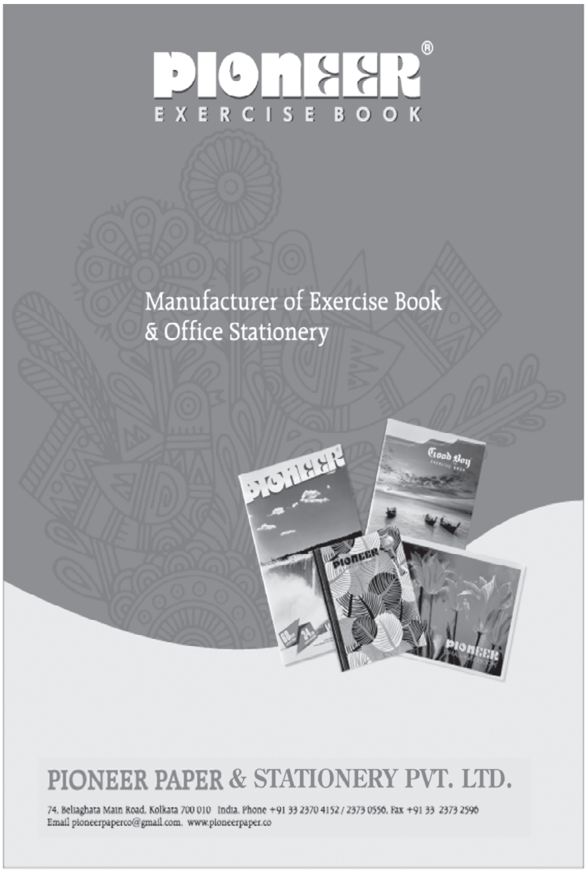

With Best Compliments from -

A

Well wisher

শ্রী বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান অনুষ্ঠান

'আত্মবিস্মৃত হিন্দু সমাজের আত্মবোধ জাগ্রত করানো এবং রাষ্ট্রীয়তার ভিত্তিতে সংগঠন নির্মাণ করা ডাঃ হেডগেওয়ারের সবচাইতে বড়ো কাজ। শক্তিশালী ভারত নির্মাণেই বিশ্বের কল্যাণ সম্ভব, এটা তখনই সম্ভব হবে যখন হিন্দু সমাজ সংগঠিত হবে। ডাঃ হেডগেওয়ারের স্বপ্ন ছিল সমর্থ, সংগঠিত ও আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণ। তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মধ্যে রয়েছে সমাজ জাগ্রত করার অসীম শক্তি।' কথাগুলি বললেন গত ১৭ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ সরকার্যবাহ রামদত্ত চক্রধর, শ্রী বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয় আয়োজিত স্থানীয় জিডি বিড়লা সভাঘরে ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান সমারোহে। এবছর ৩৪ তম ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান প্রদান করা হয় 'জীবন প্রবন্ধন গুরু' পণ্ডিত বিজয়শঙ্কর মেহতাকে। শ্রী যোগেশরাজ উপাধ্যায়ের কণ্ঠে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত বিজয়শঙ্কর মেহতাকে বংশীধর শর্মা মালা, আচার্য রাকেশ পাণ্ডে শাল, সজ্জন বনসল শ্রীফল এবং রামদত্ত চক্রধর মানপত্র ও চেক প্রদান করেন। উপস্থিত অতিথিদের মাল্যার্পণ ও অঙ্গবস্ত্র পরিয়ে অভিনন্দন জানান মহাবীর প্রসাদ রাওত, নন্দকুমার লঢ়া, অরুণ প্রকাশ মল্লাবত অজেন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, অজয় চৌবে, মোহনলাল পারীক, সত্যপ্রকাশ রায়, সঞ্জয় মণ্ডল এবং রাজেশ আগরওয়াল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আচার্য শ্রী রাকেশ কুমার পাণ্ডে। প্রধান অতিথি রূপে ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পপতি সজ্জন কুমার বনসল। মঞ্চে প্রবীণ প্রচারক গুরুশরণ প্রসাদ এবং বংশীধর শর্মাও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান চলাকালীনই আচার্য রাকেশ পাণ্ডে দ্বারা রচিত কাল গণনার ওপর একটি পুস্তিকা পণ্ডিত মেহতার হাতে উন্মোচন করা হয়।

স্বাগত ভাষণ দেন পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ মহাবীর বজাজ। অনুষ্ঠানের শুরুতেই শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী 'রাষ্ট্রমন্ত্রে জাগাইল দেশ' একক গীত পরিবেশন করেন। প্রজ্ঞা সম্মানে ভূষিত হয়ে পণ্ডিত বিজয়শঙ্কর মেহতা বলেন, ডাঃ হেডগেওয়ারের বড়ো অবদান হলো ভারতকে 'রাষ্ট্রীয়তা' শব্দ প্রদান করা। তিনি সমাজে ব্যাপ্ত চার প্রকারের অসঙ্গতি যেমন, রাষ্ট্রের প্রতি ভ্রষ্টাচার, সমাজের প্রতি অপরাধ, ব্যবস্থার প্রতি অকর্মণ্যের মানসিকতা এবং পরিবারের প্রতি উদাসীনতাকে সমস্ত সমস্যার মুল কারণ বলেছেন। এই সমস্যা দূরীকরণের জন্যই তিনি সঙ্ঘ স্থাপনা করেন।

সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ড. তারা দূগড় এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পুস্তকালয়ের উপাধ্যক্ষ ভাগীরথ চাণ্ডক। অনুষ্ঠানে কলকাতা ও হাওড়া মহানগরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। কার্যক্রমে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন মনোজ কাকড়া, ভাগীরথ সারস্বত, গুড্ডন সিংহ, শ্রীমোহন তিওয়ারী, রমাকান্ত সিন্‌হা, রৌশন শর্মা, নীতীশ সিংহ গায়ত্রী বজাজ এবং অরুণ সিংহ।

গত ১২ ডিসেম্বর জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ির ভোটপট্টিতে সক্ষম জেলা কমিটির উদ্যোগে দিবাঙ্গ ভাই-বোনেদের হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক দেবব্রত ঘোষ, অফিস সেক্রেটারি বাপন রায়, উত্তরবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক চন্দন রায়।

ফ ঃ ৬

কল্যাণ ভবনে কর্মযোগীর বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ১৭ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতী অনুমোদিত বিশিষ্ট সেবা সংস্থা কর্মযোগীর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় কলকাতা মানিকতলাস্থিত কল্যাণ ভবনে। সকাল সাড়ে দশটায় প্রদীপ প্রজ্বলন করে সভার উদ্বোধন হয়। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি শান্তনু রুদ্র, সহ সভাপতি ডাঃ তরুণ সরকার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডাঃ প্রসূন সান্যাল এবং বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক উত্তম কুমার মাহাত। বিভিন্ন জেলা থেকে ৯০ জন সদস্য সভায় অংশগ্রহণ করেন। সমবেত গীতের পর সুভাষিত পাঠ করে ঈষম ভৌমিক। স্বাগত ভাষণ রাখেন ডাঃ তরুণ সরকার। গীতার সপ্তদশ অধ্যায় শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ সমবেত পাঠ পরিচালনা করেন অঙ্কিতা মণ্ডল। এরপরে স্মরণিকা প্রকাশ করেন উত্তমকুমার মাহাত। স্মরণিকার প্রচ্ছদ এঁকেছেন শুভাঙ্গী রুদ্র। তারপরেই কর্মযোগী ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করা হয়।

সভায় কার্যবিবরণী পাঠ করেন সংস্থার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অসীম মণ্ডল। কার্যবিবরণী পেশ করেন ডাঃ প্রসূন সান্যাল। বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ কিংশুক লাহিড়ী। আগামী বছরের পরিচালন সমিতি ঘোষণা করেন সভাপতি শান্তনু রুদ্র।

এরপর প্রিয়ম সরকারের কণ্ঠে একক গীতের পর উত্তম কুমার মাহাত বৌদ্ধিক প্রদান করেন। তারপরেই ভাবগম্ভীর পরিবেশে পিতৃ-মাতৃপূজন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর দিলীপ চৌধুরীর কণ্ঠে এককগীতের পর যুগশঙ্খ পত্রিকার সাংবাদিক রক্তিম দাস বৌদ্ধিক রাখেন। কর্মযোগীর সদস্য বাঁকুড়ার বাঁকাদহ গ্রামের রবীন্দ্রনাথ খাঁড়া তাঁদের গ্রামে কর্মযোগী পরিচালিত সেবাকাজের বিশদ বিবরণ রাখেন। সভায় উপস্থিত সদস্যদের পরিচয় করিয়ে সংগঠনের বিষয়ে পথনির্দেশ করেন সংস্থার অভিভাবক তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক ডাঃ সনৎ কুমার বসুমল্লিক। সংগঠনের সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সংগঠন সম্পাদক সুব্রত মণ্ডল।

সমগ্র সভা পরিচালনা করেন পার্থ মুখার্জি এবং সমাপ্তি ভাষণ রেখে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শান্তনু রুদ্র। রাষ্ট্রগীতের পর সঙ্ঘ ও সমিতির আলাদা অলাদা প্রার্থনার পর সভার প্রথম অধিবেশনের সমাপ্তি হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে কয়েকটি ভাগে বৈঠক হয়।

উলুবেড়িয়ায় ক্রীড়া ভারতীর উদ্যোগে ক্রীড়া প্রশিক্ষণ সম্মেলন

হাওড়া গ্রাণীণ জেলার ক্রীড়া ভারতীর উদ্যোগে গত ১৭ ডিসেম্বর উলুবেড়িয়া মনসাতলা প্রণব শিক্ষা নিকেতন বিদ্যালয়ে সারাদিন ব্যাপী ক্রীড়া প্রশিক্ষণ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। কাবাডি, খো খো, যোগাসন, আত্মরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের দ্বারা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া ভারতীর পূর্বক্ষেত্র সম্পাদক ড. পার্থ বিশ্বাস এবং হাওড়া বিভাগ সংযোজক শুভেন্দু সরকার। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তাপস সেন, ইন্দ্রজিৎ চ্যাটার্জি।

ফুটবলের টোপ দিয়ে শিশুশ্রম

নিলয় সামন্ত

চার মাসের বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য বেঙ্গালুরুর একটি অ্যাকাডেমিতে পাভাল ফুটবলার হয়ে ওঠার স্বপ্ন নিয়ে বেঙ্গালুরু গিয়েছিল এক দল খুদে। যাদের বয়স ৮ থেকে ১৪। কিন্তু সেখানে পৌঁছে অন্য অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাদের। ফুটবলের বদলে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বাসন, ন্যাতা-বালতি, ঝাঁটা, ময়লা জামাকাপড়। সকলকেই সেখান থেকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের ১০ খুদে ফুটবলারকে কার্যত শিশু শ্রমিকে পরিণত করা হয়েছিল। বল নিয়ে মাঠ দাপানোর বদলে কেউ আনাজ কেটেছে, কেউ বাসন ধোয়ার কাজ করেছে, কেউ ঘর পরিষ্কার করেছে। আরও নানা কাজ করানো হয়েছে খুদে ফুটবলারদের দিয়ে। এমনই অভিযোগ বেঙ্গালুরুর একটি ফুটবল অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। চার মাসের একটি প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিতে কলকাতা থেকে বেঙ্গালুরু গিয়েছিল তারা। এক মাসের মধ্যেই তাদের ভালো ফুটবলার হয়ে ওঠার স্বপ্ন ধাক্কা খায় দক্ষিণের ওই রাজ্যে। কর্ণাটকের যুব লিগে খেলার সুযোগ করে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল ১০ ফুটবলারকে। সে সব যে শুধুই কথার কথা তা এক মাসেই বুঝে যায় তারা। শুধু নিজেদের রান্না, জামাকাপড় কাচা, ঘর পরিষ্কার, বাসন ধোয়া বা অন্য কাজ করতে হয়নি, অ্যাকাডেমির কোচ, কর্তা এবং অন্যদের সব কাজও করানো হয়েছে তাদের নিয়ে।

কয়েকদিন এমন চলার পর নিজেদের বাড়িতে ফোন করে খুদে ফুটবলারেরা সব কিছু জানায়। তারা জানায়, অত্যন্ত নিম্নমানের খাবার তাদের দেওয়া। ঠিক মতো কাজ না করলে মারধর করা হচ্ছে।

তাদেরই একজন শুভদীপ কুণ্ডু বলেছে, ‘খেলার সুযোগ ওখানে খুবই কম পেয়েছি আমরা। দিনের বেশিরভাগ সময় বিভিন্ন কাজ করেই কেটে যেত। আমাদের দিয়ে রান্না, জামাকাপড় কাচা বা ঘর পরিষ্কার করানো হয়েছে। বাথরুমও পরিষ্কার করতে হয়েছে আমাদের।’ আর এক খুদে ফুটবলার ঈশান লস্কর বলেছে, ‘আমার ওখানে বেশ ভয় করছিল। বাড়ি ফিরতে চাইলে প্রত্যেকের কাছে ২০ হাজার টাকা করে চাওয়া হয়েছিল। আমাদের মারধর করা হয়েছে। খুব কম এবং খারাপ খাবার দেওয়া হতো আমাদের।’

যে সংস্থা ১০ জনকে ফুটবল প্রশিক্ষণের জন্য বেঙ্গালুরুর ওই অ্যাকাডেমিতে পাঠিয়েছিল, তারা বিষয়টি জানতে পেরেই কলকাতা পুলিশের দ্বারস্থ হয়। ১০ খুদে ফুটবলারকে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হয় রাজ্যের ফুটবল সংস্থা আইএফএ। সচিব অনির্বাণ দত্ত এবং সহ-সভাপতি সৌরভ পাল সব কিছু তদারকি করেছেন। বাড়ি ফিরে আসার পর ক্রমশ স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করছে শুভদীপ- ঈশানরা। সোনারপুরের একটি অ্যাকাডেমির শিক্ষার্থী তারা। সেই অ্যাকাডেমি থেকেই উন্নত প্রশিক্ষণে লক্ষ্যে চার মাসের জন্য বেঙ্গালুরু পাঠানো হয়েছিল ১০ খুদেকে। বাড়ি ফিরে নিজেদের চেনা অ্যাকাডেমিতেই আবার অনুশীলন শুরু করেছে তারা। অ্যাকাডেমির সভাপতি তন্ময় বোস বলেছেন, ‘অত্যন্ত খারাপ পরিবেশ থেকে ছেলেগুলোকে উদ্ধার করে আনা গিয়েছে।

আমরা খবর পাওয়ার পরেই কলকাতা পুলিশ, আইএফএ-সহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষে সাহায্যের আবেদন করেছিলাম। সকলেই অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে আমাদের সাহায্য করেছেন। ছেলেগুলোর সঙ্গে শিশুশ্রমিকের মতো আচরণ করায়, ওদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল। এখন অনেকটা স্বাভাবিক হতে পেরেছে ওরা। আবার আমাদের অ্যাকাডেমিতে অনুশীলন শুরু করেছে।’ □

দেশ গঠনের জন্য কিছু সংকল্প

ড. রামানুজ গোস্বামী

আগত ইংরেজি বছরটি ভারত ও ভারতীয়দের জন্য এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বছর হতে চলেছে। আমরা যারা সনাতন ধর্ম বা হিন্দুধর্মাবলম্বী, তাদের জন্য তো এই বছরটি নিঃসন্দেহেই অতীব মাহাত্ম্য বহন করে আনতে চলেছে। কারণ, আর মাত্র কয়েকদিন পরেই এই বহু প্রতীক্ষিত মুহূর্তের সাক্ষী হতে চলেছি আমরা। সুদীর্ঘ কয়েকশো বছরের ইসলামি ও ইংরেজ শাসনের পর অবশেষে অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধন ও শ্রীশ্রীরামলালার অভিষেক সম্পন্ন হতে চলেছে। তবে স্বাধীন ভারতেও কাজটা মোটেও সহজ ছিল না। কারণ, হিন্দুবিদ্বেষী রাজনৈতিক দলগুলি কখনই চায়নি যে শ্রীরামজন্মভূমিতে মন্দির নির্মিত হোক। বলাই বাহুল্য যে, তাদের লক্ষ্যই হলো হিন্দুবিদ্বেষ ও মুসলমান তোষণ। অনেক ত্যাগস্বীকার তথা আত্মবলিদানের পরে আজ এই রামমন্দিরের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হতে চলেছে। এটা নিঃসন্দেহেই সারা বিশ্বের হিন্দুদের জন্য এক পরম প্রাপ্তি।

নতুন বছরে কিছু সংকল্প করবার প্রথা অতি প্রাচীন। কিছু শুভ বা ভালো কাজ করবার জন্য এই সংকল্প করা হয়ে থাকে। রামমন্দিরের শুভ উদ্বোধনের প্রাক্কালে আমাদের প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ হিন্দুরই উচিত হলো নিম্নলিখিত কিছু সংকল্প গ্রহণ করা। শুধু তাই নয়, এই সকল সংকল্পগুলি পালনে বদ্ধপরিকর হওয়া একান্ত কর্তব্য। এবারে একনজরে সংকল্প বা শপথবাক্যগুলি দেখে নেওয়া যাক :

১. গর্বের সঙ্গে মাথা উঁচু করে যেন আমরা বলতে পারি যে আমরা ভারতবাসী, আমরা সনাতনী, হিন্দুধর্মাবলম্বী।

২. ভারত ও হিন্দুত্ব হলো সমার্থক। তাই দেশরক্ষা ও ধর্মরক্ষা দুটিই একজন ধর্মপ্রাণ হিন্দুর কাছে একই অর্থবহন করে। এটা সর্বদাই মনে রাখা দরকার।

৩. জাতীয়তাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকারে যেন ব্রতী হতে পারি, এটাই কামনা করতে হবে।

৪. কংগ্রেস, কমিউনিস্ট এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মতো নানা আঞ্চলিক দল ভারতে রয়েছে। এরা টুকরে টুকরে গ্যাঙের মদতদাতা। তাই এদের থেকে সর্বদা সতর্ক থাকা দরকার এবং মানুষকেও সচেতন করতে হবে, অন্যথায় দেশ ও জাতি বিপন্ন হয়ে পড়বে।

৫. সঙ্ঘের আদর্শকে সাধারণ মানুষের মধ্যে আরও বেশি করে প্রচার ও প্রসারের কাজে যার যেমন সামর্থ্য বা ক্ষমতা, সেই অনুযায়ী অংশগ্রহণ করতে হবে। মনে রাখা দরকার যে, সঙ্ঘ ব্যতীত ভালো কাজ করা সম্ভব হয় না, এমনটা স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ-সহ সকল মহাপুরুষই বলেছেন। তাই এই সকল মহামানব সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা ও সঙ্ঘের প্রয়োজনীয়তার উপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

একথা আজ নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে, প্রকাশ্য কিংবা গুপ্তভাবে হিন্দুধর্মকে বিনাশ করবার জন্য ভারতের মধ্যে এবং ভারতের বাইরে চলেছে বিভিন্নরকম ষড়যন্ত্র। এর প্রমাণ সাম্প্রতিককালে কলকাতার বিগ্রেডে আয়োজিত লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা গিয়েছে। তৃণমূল সরকার এবং এই রাজ্যের প্রশাসনের পক্ষ থেকে নানা ভাবে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছিল। রাজ্যের শাসকদলের পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানের প্রকাশ্য নিন্দাও করা হয়েছে। বলাই বাহুল্য যে, কোনো ইসলামি জমায়েত বা সমাবেশের ক্ষেত্রে এমনটা বলার ধৃষ্টতা তাদের হবে না। কারণ, মুসলমানরা ভোটব্যাংক। তাছাড়া এটাও সত্য যে সহিষ্ণু হিন্দুকে কেউ গালাগালি দিলে সে মেনে নেয় (যা মুসলমান বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা একেবারেই করবে না), এমনকী হিন্দু দেব-দেবীদের উদ্দেশ্যে অশ্লীল উক্তি বা মন্তব্য করবার পরও হিন্দুসমাজের একটা বড়ো অংশই চুপ করে থাকে; এর মূল কারণ হলো সুদীর্ঘ কয়েক দশকের বাম জমানায় অত্যন্ত সুকৌশলে সাধারণ হিন্দুর মনে একটা ন্যারোটিভ তৈরি করা হয়েছিল এবং তৃণমূল সেই ধারাই বহন করে চলেছে আরও নিকৃষ্টভাবে। এর ফলে হিন্দু অস্মিতার সঙ্গে, হিন্দু ভাবনার সঙ্গে সাধারণ হিন্দু বাঙ্গালির যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল।

সনাতন ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি থেকেও পশ্চিমবঙ্গ ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়তে শুরু করে বা বলা ভালো যে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মতো প্রতিষ্ঠানগুলির অক্লান্ত প্রয়াসে এবং কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে এই রাজ্যে পটপরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। কিন্তু, এখনও অনেক পথ চলা বাকি। হিন্দুরা আজও ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। এর ফলেই টুকরে টুকরে গ্যাং এবং এই সকল রাজনৈতিক দল হিন্দুসমাজকে 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতিতে শাসন করে চলেছে। তাই সর্বাগ্রে যা দরকার তা হলো হিন্দুদের মধ্যে একতা যা তাদের হিন্দুত্বের জাগরণে উদ্বুদ্ধ করবে। হিন্দুসমাজ যাতে উঠে দাঁড়াতে না পারে, তাই সুদীর্ঘকাল ধরেই মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার আফিম সরবরাহ করেছে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট দলগুলি কিংবা তৃণমূলের মতো দল। কিন্তু আর নয়। সময় হয়েছে হিন্দু জনজাগরণের। সেই স্বতঃস্ফূর্ত জনপ্লাবন আমরা দেখলাম ব্রিগেডে যা হিন্দু বিরোধীদের ভীত করেছে। এই রকম আরও জনপ্লাবন ভবিষ্যতে ঘটেবে। সর্বোপরি ভব্য রামমন্দিরের উদ্‌ঘাটন সমারোহ যে হিন্দু ভারতের পুনরুত্থানের প্রতীক, তা বলাই বাহুল্য।

তাই, হিন্দু ধর্মাবলম্বীর একান্ত কর্তব্য হলো এই মেকি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলিকে একঘরে করা তথা হিন্দুত্বের বিশ্বব্যাপী প্রচার ও প্রসারে সচেষ্ট হওয়া। এটাই সকলের সংকল্প হওয়া উচিত। তবেই ভারত জগৎসভায় আবার শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে সমর্থ হবে। প্রতিষ্ঠিত হবে ধর্মরাজ্য।

(লেখক বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক)

সনাতন ধর্ম হলো বিশ্বাস, ভক্তি ও বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ

প্রদীপ মারিক

কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীকে বলা হয় উত্থান একাদশী, যার কথা স্কন্দপুরাণে বর্ণিত হয়েছে। এই একাদশীর অপর নাম 'প্রবোধিনী'। পুরাণ অনুযায়ী, এই একাদশীতে ভগবান বিষ্ণু শয়ন যোগনিদ্রা থেকে জেগে ওঠেন। সেই কারণে এই একাদশী পাপনাশিনী, পুণ্যবর্ধিনী ও মুক্তিপ্রদায়ী। একাদশী পালনের সঙ্গে ভগবানের উদ্দেশ্যে স্নান, দান, জপ, কীর্তন ও হোমাদি করলে তা অক্ষয় হয়ে যায়। যারা উপবাসের দিনে শ্রীহরির প্রতি ভক্তিভাবে দিনযাপন করেন, তাঁদের কাছে এই জগতে দুর্লভ বলে আর কিছু থাকে না।

চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণে স্নান করলে যে পুণ্য হয়, এই উপবাসে রাত্রি জাগরণে তার সহস্রগুণ সুকৃতি লাভ হয়। তীর্থে স্নান, দান, জপ, হোম, ধ্যানের ফলে যে পুণ্য সঞ্চিত হয়, উত্থান একাদশী পালন না করলে সে সব নিষ্ফল হয়ে যায়। একাদশী পালনের বৈজ্ঞানিক কারণও আছে। গবেষকরা উপবাসের সুবিধার কথা বিভিন্ন ভাবে ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেছেন শাস্ত্রসম্মত উপবাস স্বাস্থ্য সচেতনকারীকে উন্নত করতে পারে, যেমন ইনসুলিন সংবেদনশীলতা, রক্তচাপ ও কোলেস্টেরলের মাত্রা স্থির থাকে। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে উপবাস ওজন কমাতে সাহায্য করতে পারে এবং এমনকী বার্ধক্য বিরোধী প্রভাবও থাকতে পারে। দেব প্রবোধিনী বা দেবোত্থান একাদশীর দিনেই তুলসীবিবাহ সম্পন্ন হয়। তবে অনেকে দ্বাদশী তিথিতেও তুলসীর বিয়ে দিয়ে থাকেন। পুরাণ অনুযায়ী, রাক্ষস বংশে জন্মগ্রহণ করে বৃন্দা নামক এক কন্যা। কিন্তু বৃন্দা ছোটোবেলা থেকেই বিষ্ণুর ভক্তি ও আরাধনায় মগ্ন থাকতেন। পরে বিবাহযোগ্যা হলে বৃন্দার বিয়ে জলন্ধর নামক এক রাক্ষসের সঙ্গে হয়।

তবে বিষ্ণুর আরাধনা ও পতিব্রতা হওয়ার কারণে বৃন্দার স্বামী জলন্ধর অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে ওঠে। তার ক্ষমতার আতঙ্ক ছড়ায় দেব-দেবীদের মনেও। জলন্ধর যুদ্ধে গেলেই বৃন্দা ঈশ্বর আরাধনায় ব্যস্ত হয়ে থাকতেন। বৃন্দার বিষ্ণুভক্তি ও সাধনার কারণে জলন্ধর সমস্ত যুদ্ধে অপরাজিত থাকে। একদা দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে জলন্ধর। তখন আতঙ্কিত দেবতারা বিষ্ণুর স্মরণ করেন। জলন্ধরকে পরাস্ত করতে বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ ধারণ করে ছলনার আশ্রয় নিয়ে বৃন্দার ব্রত নষ্ট করেন। এর ফলে জলন্ধরের শক্তি কমে যায় এবং সেই যুদ্ধে তার মৃত্যু হয়। বিষ্ণুর ছলনার কথা জানতে পেরে বৃন্দা নারায়ণকে শিলা অর্থাৎ পাথরে রূপান্তরিত হওয়ার শাপ দেন। বিষ্ণুকে পাথরে পরিবর্তিত হতে দেখে দেবতারা ভীত হয়ে পড়েন। তখন লক্ষ্মীর প্রার্থনায় বৃন্দা নিজের অভিশাপ ফিরিয়ে নেন ও জলন্ধরের সঙ্গে সতী হন।

প্রচলিত যে, বৃন্দার চিতাভস্ম থেকে একটি ছোট্ট চারার উৎপত্তি হয়। বিষ্ণু এর নাম দেন তুলসী। এর পর নিজের একটি রূপকে পাথরে সমাহিত করেন। শ্রীবিষ্ণু বললেন, তুলসী ছাড়া তিনি কোনও প্রসাদই গ্রহণ করবেন না। এই পাথরই শালিগ্রাম নামে তুলসীর সঙ্গে পূজিত। তখন থেকেই কার্তিক মাসে তুলসী ও শালিগ্রামের পূজা হয়ে আসছে। প্রতি বছর কার্তিক মাসের দেব প্রবোধিনী একাদশীতে শালিগ্রাম শীলার সঙ্গে তুলসীর বিয়ে দেওয়া হয়। শাস্ত্র মতে যে বাড়িতে তুলসী থাকেন, সেখানে যম দূত অসময়ে আসতে পারেন না। আবার তুলসীপাতা ও গঙ্গাজল মুখে দিয়ে যার প্রাণ নির্গত হয়, সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি পায় ও বৈকুণ্ঠ ধাম লাভ করে। পূর্ণিমার দিনেই তুলসী রূপে পূজিত হন দেবী লক্ষ্মী।

অন্য মতে, তুলসীর বিয়ে হয়েছিল বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে। তাই ওই দিনটাকে তুলসী রূপে পূজিত হন ধনদেবী লক্ষ্মীই। তুলসীপাতার বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সুফল রয়েছে। তা স্বাস্থ্যের জন্য অনেক প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও উপকার প্রদান করে। তুলসীপাতায় ভিটামিন-এ, সি, কে ছাড়াও আয়রন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম ও পটাসিয়ামের মতো খনিজ যৌগ বিদ্যমান। এছাড়া তুলসীপাতায় প্রচুর পরিমাণে ফাইবার ও প্রোটিন রয়েছে। তুলসীগাছ বর্তমান দ্রুতগতির যুগে মানসিক চাপের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে। তুলসী জিঙ্ক ও ভিটামিন সি সমৃদ্ধ। এতে অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টি-ফাঙ্গাল এবং অ্যান্টি-ভাইরাল বৈশিষ্ট্যও রয়েছে।

এই গাছের পাতায় থাকে রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা। তুলসী অন্ত্রের প্রদাহকে শান্ত করে, যা অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়া ভারসাম্যকে রক্ষা করে এবং ভালো ব্যাকটেরিয়ার পক্ষে গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে তোলে। তুলসীপাতা শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম। এই গাছ হৃদরোগের তাৎক্ষণিক প্রতিরোধ করে তোলে। হৃদপিণ্ডের জন্য তুলসীর উপকারিতা উদ্ভিদের ইউজেনলের মতো অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলিতেও জমা হতে পারে।

এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলি ক্ষতিকারক কোলেস্টেরলের মাত্রার বিরুদ্ধে লড়াই করে। তুলসী গৃহে সুখ ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসে। বৈষ্ণবদর্শন অনুসারে, তুলসীপাতা ভগবান বিষ্ণুকে সবচেয়ে বেশি খুশি করে। তারা বিষ্ণু মন্ত্র পাঠ করার সময় একটি তুলসীপাতা ভগবান বিষ্ণুকে সবচেয়ে বেশি খুশি করে। বৈষ্ণবরা বিষ্ণুমন্ত্র পাঠ করার সময় একটি তুলসীমালা ব্যবহার করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বলেছেন, জপ হচ্ছে সেরা যজ্ঞ। এই জপ করতে তুলসীগাছের কাণ্ডের মালা ব্যবহার করা হইল। তুলসীগাছ হলো ভগবান বিষ্ণুর কম্পন এবং আত্মার সঙ্গে সম্পৃক্ত। সনাতন ধর্ম মতে উত্থান একাদশীর ব্রত পালনের সঙ্গে তুলসীগাছ পরিচর্যা করলে দেহ মন আত্মা পবিত্র হয়ে ওঠে। ভগবান বিরাজ করে আছেন প্রত্যেক জীবের দেহ ও মনে। □

সাধনোচিত ধামে প্রব্রজিকা অমলপ্রাণা

শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের সাধারণ সম্পাদক প্রব্রজিকা অমলপ্রাণা গত ২৫ ডিসেম্বর ইহলীলা সাঙ্গ করলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর।

ইকোসিস্টেম মোবাইল অ্যাপের উদ্বোধন

সংবাদদাতা॥ ইকোসিস্টেম ফোন অ্যাপের মাধ্যমে স্বাবলম্বন ও স্বদেশী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ নতুন ভারতের অর্থনীতিকে দ্রুত বিশ্বশিখরে পৌঁছানোর লক্ষ্যে কাজ চলছে। ইকোসিস্টেম প্রধান লক্ষ্য হলো, ভারতের সমস্ত স্বাবলম্বী সংস্থাকে এই প্লাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত করা। ভারতীয় ভাবধারা ও জনজীবনের দৈনন্দিন সুবিধাগুলি সকলের কাছে পৌঁছে দিতে এই অ্যাপের মাধ্যমে অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যে সুষ্ঠভাবে ক্রমবর্ধমান।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে উন্নত ভারতের লক্ষ্যে ইকোসিস্টেম মোবাইল অ্যাপটির গত ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৩ হাওড়ার বাদামীদেবী শিশু মন্দির পরিসরে শুভ উদ্বোধন হলো। এদিন এই মনোজ্ঞ কার্যক্রমে উজ্জ্বল উপস্থিতি ছিলেন সহকার ভারতীর ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক বিবেকানন্দ পাত্র, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হাওড়া মহানগর প্রচারক তরুণ বেরা, স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের ক্ষেত্রীয়-সহ সংযোজক অম্লান কুসুম ঘোষ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রচার প্রমুখ বিপ্লব রায়। এছাড়াও সনাতনী পরিবার ট্রাস্ট যারা এই অ্যাপটির প্রচারের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে, তাদের চারজন ট্রাস্টি শ্রীমতী সোমা ব্যানার্জি, আজয় প্রসাদ, পবন শর্মা ও দেবজিৎ সরকার এবং ট্রাস্টের সদস্য বিশিষ্ট অভিনেত্রী পাপিয়া অধিকারী ও সুভাষ চন্দ্র গুহ উপস্থিত ছিলেন।

ভারতমাতার পূজা, মা সরস্বতী বন্দনা ও গণেশবন্দনার মাধ্যমে শুভসূচনা হয়। শ্রীমতী সোমা ব্যানার্জির বরণ ও তিলকের মাধ্যমে অনুষ্ঠান এগিয়ে চলে। এরপরে বিবেকানন্দ পাত্রের হাত দিয়ে কম্পিউটারে অ্যাপটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। অন্যতম ট্রাস্টি দেবজিৎ সরকার অ্যাপের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও এগিয়ে চলার গতিপ্রকৃতি ব্যাখ্যা করেন এবং কর্মপদ্ধতির ব্যাখ্যা করেন।

অনুষ্ঠানে ২৮ জন উদ্যোগপতিকে সম্মানিত করা হয়। তাদের হাতে সাম্মানিক শংসাপত্র তুলে দেন বিশিষ্ট অতিথিরা। সম্মানিত উদ্যোগপতিরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে নিজস্বতা বজায় রেখে তাদের ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন এবং বহিরাগত ক্ষতিকর ব্যবসা উদ্যোগগুলিকে সরাসরি টক্কর দিয়ে চলেছেন। এই সম্মানিত উদ্যোগপতিরা ব্যবসার পাশাপাশি দেশ, সমাজ ও নিজ ধর্ম রক্ষায় বদ্ধপরিকর।

আলোচনা কালে অম্লান কুসুম ঘোষ স্বদেশী জাগরণ বিষয়ে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। বিবেকানন্দ পাত্র তাঁর ভাষণে সমবায়, হস্ত ও কুটির শিল্প নিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিশা দেখান। তরুণ বেরা লোকাল অর্থাৎ স্থানীয় ব্যবসা ও শিল্পের উন্নতিকল্পে উন্নততর ভাবনা ব্যক্ত করে শ্রোতাদের অনুপ্রেরণা দেন।

আগত অতিথিদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও শান্তি মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা হয়। আগামীদিনে এই অ্যাপটি সনাতনী ভাবধারায় চালিত হয়ে দেশ, সমাজ তথা জাতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিসাধনে প্রভূত ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে এই বিষয়ে নিশ্চিত ধারণা করা যায়।

ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ঐতিহাসিক লক্ষাধিক কণ্ঠে গীতাপাঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত ২৪ ডিসেম্বর কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড সাক্ষী থাকলো এক ধর্মবিপ্লবের, এক ব্যাপক ধর্ম জাগরণের। অখিল ভারতীয় সংস্কৃত পরিষদ, সনাতন সংস্কৃতি সংসদ এবং মোতিলাল ভারত তীর্থ সেবা মিশন আশ্রমের উদ্যোগে ব্রিগেডে অনুষ্ঠিত হলো 'লক্ষ কণ্ঠে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ'-এর অনুষ্ঠান। দেড় লক্ষাধিক সনাতনীর বিপুল জনসমাগমে এই মহতী অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠান কমিটির সভাপতি স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ (ট্রাস্টি, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ), সহ সভাপতি— শ্রীমৎ নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ (সচিব, প্রেম মন্দির আশ্রম, রিষড়া), শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী মহারাজ (সচিব, প্রভু জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ মঠ), শ্রীজগদার্তিহা দাস (যুগ্ম সম্পাদক, শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সঙ্ঘ) প্রমুখ সাধু-সন্তমণ্ডলী এই অনুষ্ঠান আয়োজনের নেতৃত্বদান করেন। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন দ্বারকা-সারদাপীঠাধীশ জগদ্গুরু অনন্তশ্রী বিভূষিত শঙ্করাচার্য সদানন্দজী মহারাজ।

দূরদূরান্ত থেকে গীতাপ্রেমীদের আগমন শুরু হয়ে যায় ২৩ তারিখ রাত থেকেই। ২৪ তারিখ, রবিবার সকাল ৯টা থেকে হয়ে যায় অনুষ্ঠনের সূত্রপাত। ব্রিগেডের অন্যান্য রাজনৈতিক সভার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল এই সনাতনী কার্যক্রম। রাজনৈতিক সভাগুলিতে আগত জনতার জন্য নানারকম খাবারের প্রলোভন ও আয়োজন থাকলেও সেই সবের বিপ্রতীপে রাজনীতি বিবর্জিত এই কার্যক্রমে উপস্থিত সাদা পাঞ্জাবি পরিহিত পুরুষ এবং লাল পাড় সাদা শাড়ি পরিহিতা মহিলা মিলিয়ে লক্ষাধিক সনাতনী প্রত্যেকে ২০ টাকা করে প্রবেশমূল্য দান করে অনুষ্ঠানে তাঁদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নাম নথিভুক্ত করেছেন। ঐতিহাসিক গীতা মহাযজ্ঞের সাংস্কৃতিক মঞ্চে সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের শিল্পীদের নেতৃত্বে উপস্থিত সনাতনীরা গাইলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ধনধান্য পুষ্পভরা'-সহ চারটি গান। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হলেও তাঁর ব্যস্ততা বশত আসতে না পারার কারণে 'লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ' অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য প্রার্থনা করে শনিবার রাতে তাঁর বার্তা পাঠিয়েছিলেন। এই অনুষ্ঠানে তাঁর পাঠানো বার্তাটি পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানের জন্য শুভেচ্ছা বার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ যেন মানুষের জীবনে সুখ-শান্তি নিয়ে আসে। আয়োজকদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি আরও লিখেছেন, 'মানব জীবনের পথপ্রদর্শক হচ্ছে গীতা। জীবন পরিচালনার হ্যান্ডবুক। গীতা জ্ঞানের ভাণ্ডার। জীবনের অন্যতম চালিকাশক্তি। গীতার আদর্শেই ২০৪৭ সালের মধ্যে শক্তিশালী ভারত গঠনের স্বপ্নপূরণ হবে। লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ আমাদের সামাজিক সম্প্রীতিকে আরও শক্তিশালী করবে, দেশের উন্নয়নযাত্রার ক্ষেত্রেও যা অত্যন্ত জরুরি।' এই ধর্মসভাকে একটি রাজনৈতিক সভা বা বিজেপি আয়োজিত সভা হিসেবে সনাতন ধর্ম-কৃষ্টি-সংস্কৃতি বিরোধী কিছু রাজনৈতিক শক্তি ও তাদের আজ্ঞাবহ সংবাদমাধ্যমের তরফে চিহ্নিত করার অপপ্রয়াসকে ব্যর্থ করে, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, গীতা পাঠ ঘরে ঘরে' ধ্বনি মুখরিত এই সভা হয়ে ওঠে অসংখ্য গীতাপ্রেমী-সনাতনীদের সম্মেলনস্থল।

শোভাযাত্রা সহকারে শ্রীশ্রী জগন্নাথদেব, শ্রীশ্রী বলভদ্র ও শ্রীশ্রী সুভদ্রা মাতার প্রতিমা অনুষ্ঠান মঞ্চে এনে প্রতিষ্ঠা করা হয়। তারপরে মঞ্চে উপবিষ্ট হয়ে তাঁর আসন অলংকৃত করেন জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য সদানন্দজী মহারাজ। এরপর শুরু হয় আরতি, বরণ, মঙ্গলাচরণ- বেদপাঠ। জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন সনাতন ধর্মের মূল বিচার ও তার প্রয়োগ। তিনি বলেন, প্রজাকে শাসন করেন রাজা, এবং রাজা চালিত হন ধর্মের দ্বারা, যে ধর্মের নির্দেশ দান করেন ধর্মাধিকারী। তাই এই ঋষি ধর্মই প্রবহমান ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির মূল ধারা স্বরূপ, যার প্রধান বিষয়বস্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে

পার্থ অর্জুনকে ‘শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা’-রূপে প্রদান করেন লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। আঠারোটি অধ্যায় সমন্বিত ব্রহ্মবিদ্যার এই সংকলন একটি সম্পূর্ণ জীবন দর্শন। তাঁর আশিসবাণী সংবলিত ভাষণের পর সভায় শুরু হয় সমবেত গান— বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল রচিত ‘শেষ সওগাত’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘হে পার্থসারথি, বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ’। সমবেত সংগীত শেষে শুরু হয় লক্ষাধিক কণ্ঠে গীতা পাঠ। গীতার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, দ্বাদশ, পঞ্চদশ অধ্যায় সমূহ পাঠ করা হয়। অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষতম শ্লোকটি তিনবার পাঠ করে গীতাপাঠ সমাপ্ত হয়।

গীতাপাঠ শেষে সমগ্র সভা মুখরিত হয়ে ওঠে ৬০ হাজারের বেশি শঙ্খধ্বনিতে। তারপরে ‘লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ’ কমিটির সভাপতি স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ তাঁর দৃপ্ত বক্তৃতার মাধ্যমে সভায় আগত সকল সনাতনীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আজ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত জুড়ে সনাতনী-হিন্দুদের ওপর প্রতিনিয়ত যে হিংস্র আক্রমণ নেমে আসছে তার মোকাবিলায় শ্রীভগবান কথিত গীতার বাণীকে সম্বল করে, তার থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে ধর্মরক্ষা ও অধর্মের-অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সার্বিক প্রতিরোধের বিষয়টি তিনি দৃঢ় ভাবে উপস্থাপন করেন। মহারাজ বলেন, ‘আমরা অনেক আর্জি জানিয়েছিলাম, গীতা পাঠের দিন যাতে টেট পরীক্ষা না হয়। কিন্তু আমাদের আর্জি শোনা হয়নি।’ তাঁর বক্তব্যে এদিন উঠে আসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামও।

প্রদীপ্তানন্দজী বলেন, ‘গীতার শিক্ষা হলো বাঁচার উপায়। দেশভাগকে ভুললে চলবে না। শ্যামাপ্রসাদের তৈরি পশ্চিমবঙ্গের আজ ঘোর দুর্দিন। আজ সাধুসন্তদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে নেতৃত্ব দিতে হবে, সংগঠিত করতে হবে। আজ বাঙ্গালি বলে পরিচয় দিতে আমাদের লজ্জা হয়! কোথায় পৌঁছে গিয়েছি আমরা? যে গৈরিক বস্ত্র আমরা পরিধান করি, তা আমাদের আশ্রম। সেই আশ্রম পশ্চিমবঙ্গে আজ বিপন্ন! এখনও কী সাধুসন্তরা ঘরে বসে জপ-তপ করবেন? শ্রীকৃষ্ণ অনেক অসুর বধ করেছিলেন। কিন্তু কুরুক্ষেত্রে নিজে যুদ্ধ না করে অর্জুনকে দিয়ে যুদ্ধ করিয়ে শত্রু বিনাশ করেছিলেন। আমাদের সেই কাজ করতে হবে অর্জুনের মতো। বলতে হবে— ওগো হিন্দু তোমরা জাগো। বঙ্গজননী আজ কাঁদছেন। এই রাজ্যের দামাল ছেলেরা স্বাধীনতাযুদ্ধে গীতা হাতে নিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন, সেটা ভুলে গেলে চলবে না। সমাজের দানবকে আপনারা চিনে নিন। কে শূদ্র, কে বৈশ্য, কে ব্রাহ্মণ এসব ভুলে বলুন, আমরা সবাই হিন্দু। আমরা অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখি। আর তার জন্য অসুরদের বিনাশ করতে হবে। আজ সময় এসেছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে আমরা না থাকলে পদ্মফুলও ফুটবে না। ঘাসফুলও ফুটবে না। কাস্তে হাতুড়িও থাকবে না।’

এই ধর্মসভা আয়োজনের মাধ্যমে সাধুসন্তরা বুঝিয়ে দিলেন, পশ্চিমবঙ্গে সনাতনী সংস্কৃতিকে এতদিন দাবিয়ে রাখা হয়েছিল। এবার তার উত্থানের সময় সমাগত। কলকাতা তথা গোটা বিশ্ব এদিন প্রত্যক্ষ করল একটি রাজনৈতিক স্লোগানহীন ব্রিগেড, যেখানে মঞ্চে উপস্থিত প্রায় সকলেই সন্ন্যাসী এবং তার সঙ্গে ধ্বনিত মন্ত্র-স্তোত্র। রবিবাসরীয় প্রভাতে বিপুল জনসমাগমে ব্রিগেড ময়দানের কোণায় কোণায় পরিপূর্ণ এই সভায় পাঞ্চজন্যের বজ্রনির্ঘোষের সঙ্গে স্থাপিত হলো ৩টি বিশ্বরেকর্ডও। দেড় লক্ষ কণ্ঠে একত্রে গীতা পাঠ, ৬০ হাজারের বেশি শঙ্খধ্বনি এবং দেড় লক্ষ কণ্ঠে নজরুলগীতি গাওয়ার বিশ্বরেকর্ডের স্বীকৃতি ‘অফিসিয়াল ওয়ার্ল্ড রেকর্ড’ সংস্থার তরফে ‘লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ’-এর আয়োজকদের প্রদান করা হয়। সকালে শ্বেতশুভ্র বসন এবং ওম্ লেখা পতাকা হাতে নিয়ে ব্রিগেডমুখী হয়েছেন লক্ষাধিক সনাতন ধর্মের মানুষ। এ এক আশ্চর্য ছবি যা অতীতের সঙ্গে মেলে না! সব অর্থেই ২০২৩-এর ২৪ ডিসেম্বর এক ঐতিহাসিক ব্রিগেডের সাক্ষী থাকল রাজ্য তথা গোটা দেশ। □

মথুরা শ্রীকৃষ্ণজন্মভূমিতে প্রাথমিক সমীক্ষার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ এলাহাবাদ হাইকোর্ট গত ১৪ ডিসেম্বর মথুরায় শ্রীকৃষ্ণজন্মভূমি মন্দির সংলগ্ন ইদগাহ্ মসজিদের প্রাথমিক সমীক্ষার নির্দেশ দিয়েছে। আদালত নিযুক্ত ৩ সদস্য বিশিষ্ট অ্যাডভোকেট কমিশনারদের একটি টিম এই সমীক্ষার কাজ পরিচালনা করবেন। পরবর্তী শুনানিতে এই সমীক্ষার পদ্ধতি গ্রহণের বিষয়ে চূড়ান্ত নির্দেশ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে হাইকোর্ট। হিন্দুদের তরফে আইনজীবী বিষ্ণুশঙ্কর জৈন জানান যে তাঁরা অ্যাডভোকেট কমিশনারের তত্ত্বাবধানে শাহি ইদগাহ্ মসজিদের সমীক্ষার আবেদন জানিয়েছিলেন যাকে স্বীকৃতি দিয়েছে হাইকোর্ট। শাহি ইদগাহ্ মসজিদের বক্তব্য এদিন খারিজ করেছে হাইকোর্ট। হিন্দুদের আবেদন অনুযায়ী এই বিতর্কিত শাহি ইদগাহ্ মসজিদের স্থাপত্যটি প্রাচীন হিন্দু মন্দিরের অসংখ্য চিহ্ন ও সাক্ষ্য বহন করছে। তাই এটির ধর্মীয় অবস্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অ্যাডভোকেট কমিশনারের নেতৃত্বে এই সমীক্ষার নির্দেশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিচারপতি মায়াঙ্ক কুমার জৈন গত ১৬ নভেম্বরের শুনানিতে রায়দান স্থগিত রেখেছিলেন। হিন্দুদের দাবি শ্রীকৃষ্ণজন্মভূমিতে ১৩.৩৭ একর জমিতে অবস্থিত মন্দিরটি ধ্বংস করে তার ওপরে মুঘল বাদশা ঔরঙ্গজেব এই ইদগাহ্ মসজিদটি নির্মাণ করেন। আদালতে মূল মামলাটির সঙ্গে আরও ১৭টি আবেদন দাখিল হয়েছে যার মাধ্যমে যেখানে শাহি ইদগাহ্ মসজিদের অবস্থান স্থলটিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমানের বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সঙ্গে বিতর্কিত মসজিদটির অপসারণের বিষয়ে বিবাদী পক্ষের উদ্দেশ্যে নির্দেশ জারির আবেদনও জানানো হয়েছে।

মকর সংক্রান্তি উৎসবের শুভক্ষণে
বনবাসী বন্ধুদের সাহায্যার্থে
বস্তু এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করুন—

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম